পোড়ো দুর্গের রহস্য

গৌতম রায়



গোড়ো দুর্গের রহস্য

গৌতম রায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

নববর্ষ ১৩৯৪

এপ্রিল ১৯৮৭

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী

গৌতম রায়

মুদ্রক

এন. এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন

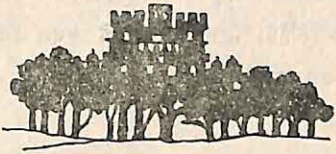
কলকাতা ৭০০০১২

দশ টাকা

শ্রদ্ধেয় কবি ও সাহিত্যিক
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুজনেষু

লেখকের অন্যান্য রচনা

★গ্রীক প্রেম কথা
★গ্রীক ট্রাজেডি (প্রথম খণ্ড)
অমৃতকন্যা
★পঞ্চম পিতা (রহস্য)
★সোনার ঈগল (ছোটদের রহস্য)
★পাপড়ি রহস্য (রহস্য)
মহাকালির মুণ্ডমালা (ছোটদের রহস্য)
★ছোটদের ইলিয়াড
★ছোটদের ওডিসি
★ছোটদের হোমার রচনা সমগ্র
খাঁচার পাখি (নাটক)
পদ্মপাতায় জল (নাটক)
অঘটন (একাঙ্ক)
এই আমি (একাঙ্ক)
মধুরেণ (শ্রীমতী ভয়ঙ্করী) নাটক
ছন্দপতন (নাটক)
কনে বিভ্রাট (নাটক)
শ্রীমান নাবালক (নাটক)
বউ কথা কও (নাটক)
ইতিহাসের জ্যান্ত ভূত
পাবলিক সারভেন্ট (একাঙ্ক)
জুয়েল থীফ (ছোটদের একাঙ্ক)
পঞ্চশর (রহস্য)
স্বৈরিণী
শ্রীমতী ভয়ঙ্করী (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ
রাজনিদ্রা (নাটক) যন্ত্রস্থ
মহাকালের নায়িকা যন্ত্রস্থ
ব্ল্যাক প্রিন্স (রহস্য) যন্ত্রস্থ



সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনে নীল ব্যানার্জী ভ্রু তুলে অজুর দিকে তাকাল। অজু তখন সকালের দৈনিক নিয়ে ব্যস্ত। নীল নিজের মনেই বলল, 'এত হন্তদন্ত! নিশ্চয় কোন গোলমেলে ব্যাপার। তাও একজন নয় দুজন।'

নীলের স্বগতোক্তি শেষ হতে না হতেই ওরা দুজনে এসে ঘরে ঢুকল। তাতন আর শুভ্র। নীল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'টু মাস্কেটিয়ার্সকে বেশ ফাঁপড়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। তা আর একজন কোথায়?'

সোফার ওপর ধপাস করে বসে তাতন বলল, 'বুম্বা এখন ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। রহস্য টহস্য ওর মাথায় তেমন আসে না।'

'তার মানে বলতে চাইছিস তোরা খুব সিরিয়াস রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস?'

শুভ্রও তাতনের পাশে বসে পড়েছিল। ও বলল, 'না নীলকাকু, তুমি যতই ঠাট্টা কর না কেন, সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে তুমিও কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যাবে।'

'এই রকম ব্যাপার?'

'হ্যাঁ। তাতন চিঠিটা নীলকাকুকে দে তো।'

'দাঁড়া, আগে তোদের চা জল খাবারের ব্যবস্থা করি। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট না করেই বেরিয়ে পড়েছিস। দীনুটা কদিন ছুটি নিয়েছে। আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখতে রাখতে অজু বলল, 'ঠিক আছে, তুই বস। আমি দেখছি। তোর হাতের চা খাওয়া যায় না। তবে, মাস্টার তাতন, তোমার রহস্য কাহিনীটা একটু পরে আরম্ভ কোরো, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত।'

অজু বেরিয়ে গেল। 'ভালোই হল' বলতে বলতে নীল সোফায় বসে সিগারেট ধরাল। তারপর তাতনের দিকে ফিরে বলল, 'কী যেন চিঠির কথা তোরা বলছিলি?'

শুভ্র বলল, 'কিন্তু আরম্ভ করাটা কি ঠিক হবে ? জয়কাকু রেগে যাবে।'

'আঃ, আরম্ভটা করছে কে ? চিঠিটা কী তাই দেখতে চাইছি।'

পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তাতন বলল, 'আজ সকালেই চিঠিটা পেয়েছি। মন দিয়ে পড়। লিখছে আমার মাসতুতো ভাই খোকন।'

তাতনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল নীল। সাধারণ রুলটানা কাগজের পাতা তিনেকের চিঠি। প্রেরকের ঠিকানা দেওঘর। বিহার। নীল চিঠিটা পড়া শুরু করল—

প্রিয় তাতন, অনেকদিন তোর কোন চিঠি পাইনি। ভেবেছিলুম তুই না লিখলে আর তোকে কোন চিঠিই লিখব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখা গেল না। আমি বা আমরা এখন যে পরিবেশের মধ্যে পড়েছি তাতে করে সর্বপ্রথম মনে পড়ল তাতন, দি গ্রেট ক্ষুদে গোয়েন্দার কথা। অবশ্য আমার এই ঘটনার সঙ্গে গোয়েন্দার কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কিন্তু রহস্যপ্রিয়দের কাছে এই চিঠির নিশ্চয় আকর্ষণ থাকবে। একটা অদ্ভুত ধরনের রহস্যের মধ্যে এখন আমাদের দিন কাটছে।

রাজু কাকাকে তুই তো চিনিস। হয়ত এখানে এসে দু-একবার দেখেওছিস। আর, মেসোমশাই, মানে তোর বাবার কাছে লেখা মায়ের চিঠি থেকে নিশ্চয় তুই জেনেছিস আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে রাজুকাকা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুটা হয়েছিল অপঘাতে। রাজুকাকা জলে ডুবে মরেছিলেন।

রাজুকাকার মৃত্যু আমাদের ফ্যামিলির পক্ষে বেশ শকিং। বাবার ভাইদের মধ্যে রাজুকাকা ছিলেন সব থেকে ছোট আর ট্যালেন্টেড। অবিবাহিত রাজুকাকা ছিলেন বিজ্ঞানী। আত্মভোলা মানুষ। সর্বদাই নিজের ল্যাবরেটরিতে নানান রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে ডুবে থাকতেন। সম্প্রতি কী যেন একটা দারুণ কিছু উনি আবিষ্কার করেছিলেন। সদাগম্ভীর রাজুকাকা সাধারণত কারো সঙ্গে খুব একটা বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। যেটুকু মাঝে মাঝে কথা বলতেন সেটা আমার সঙ্গেই। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন আমাকেও বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হবে। সত্যকে জানার এর থেকে বড় আর কিছু নেই। আরো একটা কথা বলেছিলেন চুপিচুপি। উনি নাকি বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারে নাকি সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

এ হেন রাজুকাকার মৃত্যু খুব স্বাভাবিক কারণেই ফ্যামিলির পক্ষে ডিজাস্টার।

বাবা বা মেজকা খুব আঘাত পেয়েছেন। মা, কাকীমা বা বাড়ির সবাই যখন শোকে মুহ্যমান, তখন আমি, রাজুকাকার জন্যে গোপনে কান্নাকাটি করলেও, আমার মনে একটা খট্‌কা তীরকাঠির মত বিঁধছিল। যেটা এখনও আছে।

যে কোন প্রাণীর যে কোন সময়ে মৃত্যু হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জলে ডুবে রাজুকাকার মৃত্যু আমার কাছে মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। তুই নিশ্চয়ই বলবি, জলে ডুবে কি কোন মানুষের মৃত্যু হয় না? কেন হবে না, হাজার হাজার হচ্ছে। কিন্তু রাজুকাকা? হতেই পারে না। প্রথমত রাজুকাকা পুকুরে স্নান করতে যাবেন না। কারণ উনি সাঁতার জানেন না। দ্বিতীয়ত, অনেক বেলায় উনি ঘুম থেকে ওঠেন। ভোরবেলা উঠে উনি কোনমতেই পুকুরের ধারে যাওয়া বা স্নান করার কথা কল্পনা করবেন না। বারো মাসই উনি গরম জলে স্নান করতেন। আর্থারাইটিজের জন্যে ওনার ঠাণ্ডা জলে স্নান কমপ্লিটলি বারণ। তার মানে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা অসাবধানে উনি পুকুরে ডুবে যেতে পারেন না। এ ছাড়া অপঘাত মৃত্যুর আর যে কারণ থাকতে পারে তা হল আত্মহত্যা। কিন্তু তাই বা করতে যাবেন কেন? তার ওপর যিনি সদ্য সদ্য এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন যা নাকি তাঁর ধারণায় সমস্ত পৃথিবীতে আলোড়ন তুলবে। আলোড়ন কতটা উঠবে তা আমার জানা নেই। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক নিজে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে এত বেশী আশাপ্রদ তিনি কোন যুক্তিতে আত্মহত্যা করবেন? তুই কী বলবি জানি না, কিন্তু এটা আমার খট্‌কা।

আর পাঁচটা মৃত্যুর মত রাজুকাকার মৃত্যু একটি জাগতিক ঘটনা। কিন্তু এর পর থেকে শুরু হল অদ্ভুত আর বিদঘুটে কাণ্ডকারখানা।

আমার মেজকা জীতেন সেন পোস্টঅফিসের বড়বাবু। মানে পি এম। যেহেতু পোস্টঅফিসটা আমাদের বাড়ির থেকে খুব বেশী দূর নয় মেজকা দুপুরে বাড়ি চলে আসতেন স্নান খাওয়ার জন্যে। রাজুকাকা মারা যাবার প্রায় মাস খানেক পর একদিন দুপুরে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। শটকাট করার জন্যে উনি মাঠ ডিঙিয়ে পুকুরের পাড় ঘেঁষে বাড়ির পিছনের খিড়কি দিয়ে আসতেন। পথে পড়ে একটা বিরাট বাগান। এখানকার লোক বলে 'নারিয়েল বাগান'। সেদিন আকাশে কোন ঝড় ছিল না। মেঘও না। বাগান জনশূন্য। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই মাথার ওপর ভেঙে পড়ল একটা কচি ডাব। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উনি এদিক ওদিক খোঁজ করেছিলেন। কেউ ছিল না আশেপাশে। কোন রসিক দুষ্টু ছেলেও নয়।

এ ঘটনাকে তুই গুরুত্ব নাও দিতে পারিস। প্রকৃতির নিয়ম অথবা অনিয়মে একটা কাঁচা ডাব মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলোকে তুই কী বলবি? ভূতুড়ে সিরিজ?

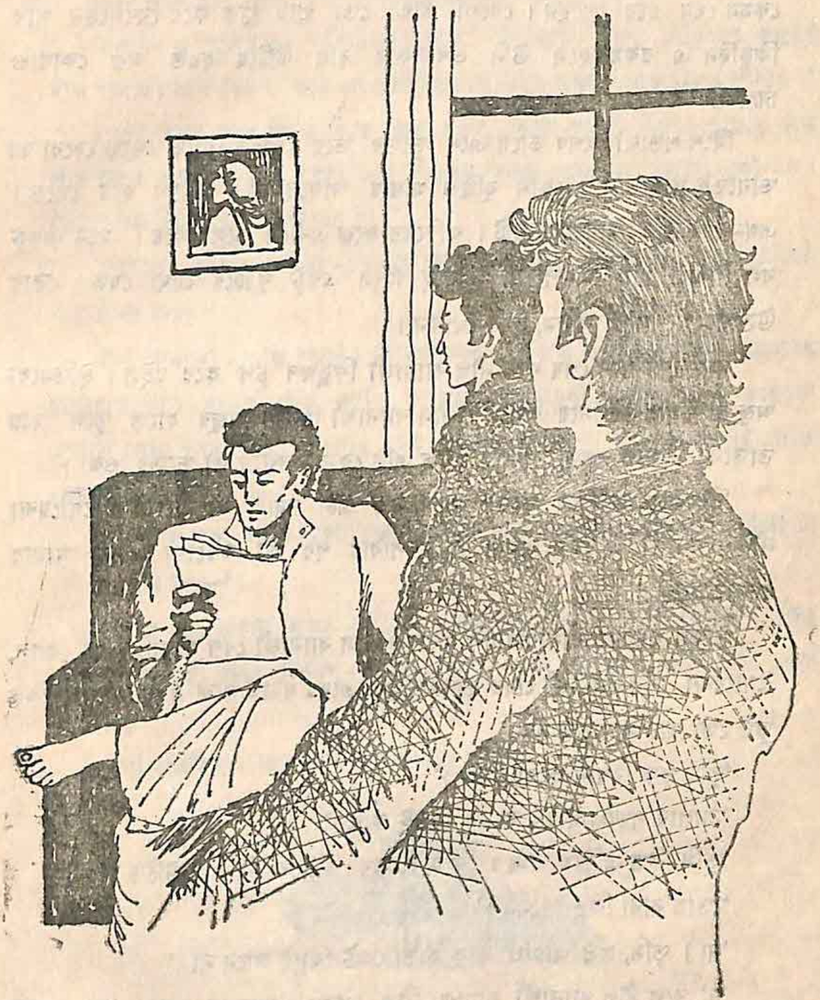
আমার বোন নেলিকে তো তুই দেখেছিস। দিনের বেলা মহা ডানপিটে আর গেছো মেয়ে। কিন্তু রাত্তির বেলা ভূতের ভয়ে কেঁচো। ভূতের গল্প শুনতে আর ভয় পেতে ওর জুড়ি নেই। তো এক সন্ধ্যেবেলা ও গেছে তুলসীতলায় সন্ধ্যে দিতে। আমাদের তুলসীতলাটা বাড়ির পিছন দিকে। মাথা নিচু করে নমস্কার করার সময় ওর মনে হয়েছিল কে যেন ওর ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রথমটা ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার হতেই নেলি পিছন ফিরে দেখতে পায় রাজুকাকা ওঁর নাইট গাউন পরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন খিড়কির দিকে। ও চিৎকার করে ওঠার আগেই রাজুকাকা অন্ধকারে মিলিয়ে যান। এর পরেই নেলি অজ্ঞান। নেলির ঘটনার সপ্তাহখানেক পরেই সন্ধ্যেবেলা একদিন মেজোকাকী দেখেন রাজুকাকা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ল্যাবরেটরী ঘরের দিকে চলে গেলেন। ওঁর গায়ে তখনও সেই নাইট গাউন।

সব থেকে হতবুদ্ধির ঘটনাটা ঘটল বাবার ক্ষেত্রে। ভূতটুতের ব্যাপারে বাবার তেমন কোন আগ্রহ বা ভয়টয় নেই। ভূতের ব্যাপারট্যাপারগুলো উনি বরাবরই 'স্রেফ গাঁজা' বলে উড়িয়ে দেন। দিন পনের আগে একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের বিছানায় শুতে গিয়ে দেখেন কে যেন ওঁর বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবা ভেবেছিলেন বুঝি আমিই। দু-একবার আমার নাম করে ডাকার পর উনি কম্বল সরিয়ে আমার ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখেন কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে একটি কঙ্কাল।

বাবাকে কোন ভয় পেতে বা কোন রকম সীন তৈরী করতে কখনো দেখিনি। বরাবরই উনি বেশ গম্ভীর। সেই বাবাই 'ব্যাপারটা কী হোল', 'ব্যাপারটা কী হোল' বলে হুড়মুড় করে ছুটে বাইরে এসে ধপাস করে বসে পড়েন। তারপর বাবার মুখে সব কথা শুনে আমরা তাড়াতাড়ি ওনার বিছানার কাছে ছুটে যাই। কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। দেখতে কিছু পাইনি এটা যেমন সত্য তেমন বাবা মিথ্যে কথা বলেছেন বা বাবা ভুল দেখেছেন এটাও ভাবতে পারছি না।

এক সপ্তাহ যাবৎ আর একটি উপদ্রব শুরু হয়েছে। শুধু আমরা নই, এখানকার অনেকেই শুনেছে গভীর রাতে কে যেন কোথায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাঁশী বাজানো ছিল রাজুকাকার অবসর কাটানোর একটি প্রিয় সঙ্গী। যখন উনি

গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন না তখন আপন মনে নিজের ঘরের জানালার ধারে বসে বাঁশী বাজাতেন।



এখানকার সবার ধারণা রাজুকাকা অপঘাত মৃত্যুর পর এ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেননি। তাই তিনি বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বারবার নিজের বাড়িতে আসার চেষ্টা করছেন। আমাদের পারিবারিক বন্ধু বলাই মুখার্জিও সেই কথা বলেছেন। উনি আবার জ্যোতিষীও বটে। ওঁর মতে আমাদের গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেওয়া উচিত। তাতেও যদি কিছু ফল না হয় তাহলে কিছু অনিষ্ট

হওয়ার আগে এ বাড়ি ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। প্রেতাত্মার প্রতিহিংসায় নাকি আমাদের বংশে আরো অনেক ক্ষতি হবার আশংকা আছে। বাবার মত মানুষও কেমন যেন হয়ে গেছেন। মেজো কাকা তো প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন আর কিছুদিন এ রকম হলে উনি এখানকার বাস উঠিয়ে হয়ত অন্য কোথাও চলে যাবেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে ভূতের ভয়ে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দেবো তা ভাবতেই পারছি না। কোন বুদ্ধিও মাথায় আসছে না। পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তো বেশ কিছুদিনের ছুটি। কদিনের জন্যে এখানে চলে আয়। মনে একটু বল পাওয়া যায়। ব্যাপারটা দু ভাই মিলে একটু খুঁটিয়ে দেখা যেত। তোর উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম, ইতি খোকন।

লম্বা চিঠি পড়া শেষ করে নীল ব্যানার্জী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ইতিমধ্যে অজু চা জলখাবার নিয়ে এসেছে। নীল ব্যানার্জী চিঠিটা অজুর হাতে তুলে দিয়ে তাতনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার কাছে এলি কেন ? আমি কী ভূতের ওঝা ?'

'নীলকাকু, তুমি যে ভূতের ওঝা নও এটা সবাই জানে। কিন্তু গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জী এ রকম একটা চিঠি পাবার পর কী করতেন এটাই আমার জানার ইচ্ছে।'

তাতন কথাগুলো সিরিয়াসলি বললেও নীল ব্যানার্জী বেশ হাল্কা সুরেই বলল, 'গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জী চোর ডাকাত খুনী এদের ধরার জন্যে মাথা ঘামায়, কিন্তু ভূত তো তার সাবজেক্ট নয়।'

'তুমি ভূত বিশ্বাস করো নাকি ?'

'ঠ্যালায় পড়লে মানুষ অনেক কিছুই করে।'

'তুমি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছ। সে যাক, এখন আমার কী করা উচিত ?'

'তোর বাবা কিছু জানেন ?'

'না। তুমি, শুভ্র আর জয়কাকু ছাড়া কেউ কিছুই জানে না।'

'হুঁ', বলে নীল ব্যানার্জী সামান্য কিছু ভাবল। তারপর বলল, 'খুব একটা ছেলেমানুষ নস। এর আগে দু দুবার* দুটো রহস্য নিয়ে তোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হয়েছে। বলা যায় না এটা একটা নতুন ধরনের কিছু হতে পারে।'

'তার মানে তুমি যেতে বলছ ?'

---

*'সোনার ঈগল' ও 'মহাকালীর মুণ্ডমালা'য় তাতনের হাতেখড়ি।

'আরে বাবা নিদেনপক্ষে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরেও তো আসা হবে। ওসব পাঠ তো আমরা ভুলতে বসেছি।'

এমন সময় শুভ্র বলল, 'যদি সত্যিই ভূতটুতের ব্যাপার হয়—'

'সঞ্চয়ের ঝুলিতে নতুন অভিজ্ঞতা বাড়বে,' কথাগুলো বেশ নির্বিকার ভাবেই নীল ব্যানার্জী বলে দিল। 'আর একান্তই যদি ভয় করে অজুকে সঙ্গে নিতে পারিস।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অজু বলল, 'বুড়ো বয়েসে নীলের পাল্লায় পড়ে জান যেতে বসেছে, নতুন করে আর ভূতের ম্যাও সামলাতে আমি রাজী নই। তোরা ডানপিটে ছেলে' তোরাই যা।'

'তাহলে, তুমিই চল না নীলকাকু আমাদের সঙ্গে,' শুভ্র বেশ আগ্রহ নিয়েই কথাগুলো বলল।

নীল ব্যানার্জী সামান্য হাসল। তারপর বলল, 'কোন্ ওজুহাতে আমি তাতনের মাসীমার বাড়ি যাব? নাকি আমি তাতনের সমবয়েসী কোন বন্ধু? তাছাড়া এখানে কোন খুনখারাপির ব্যাপার নেই। কেউ আমাকে ভূত তাড়াবার জন্যে নেমন্তন্নও করেনি।'

'সরি নীলকাকু, আমি এতটা ভেবে বলিনি —সত্যিই তো, তোমার যাওয়াটা ঠিক শোভন নয়—'

'তোরা বরং একটা কাজ করতে পারিস, সে রকম কোন সিরিয়াস কিছু বুঝলে আমাকে চিঠি লিখিস। অবস্থা বুঝে তখন ব্যবস্থা। উইস ইউ বেস্ট অব লাক্।'

বেলা বাড়ছিল। তাতন আর শুভ্র উঠে পড়ল।



১০৩ আপ ডিলাক্স এসি যখন যশিডি পৌছল তখন ঠিক দুটো বেজে চার মিনিট। তাতন একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব তাজ্জব ব্যাপার। রেল কোম্পানীর খাতায় অ্যারাইভ্যাল টাইম লেখা আছে দুটো বেজে তিন মিনিট। গাড়ি পৌছল দুটো বেজে চার মিনিটে। ভাবা যায় না।'

যশিডিতে গাড়ি দাঁড়ায় মাত্র দু মিনিট। শুভ্র তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বলল,

'এই তোদের বড় দোষ। গাড়ি ঠিক টাইমে রান করলেও টিপ্পনি কাটা ছাড়বি না। কেন ইণ্ডিয়ার কি সবই খারাপ?

তাতন একবার আড় চোখে শুভ্রকে দেখে নিয়ে বলল, 'বুঝেছি—নে, এবার চল, কী পাওয়া যায় দেখি।'

স্টেশন ছেড়ে প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুভ্র বলল, 'আমরা তো যাব দেওঘর। এখান থেকে ছোট ট্রেন পাওয়া যাবে, তাতে গেলেই তো হত।'

'নাঃ, আর ট্রেনে চাপতে ভালো লাগছে না। তার চে চল একটা টাঙা ধরে নিই। অনেকদিন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠিনি।'

টাঙা পেতে দেরী হল না। ঘোড়া আর সহিসের চেহারা দেখে ওদের দুজনেরই প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব এসেছিল। দুটোই ধুঁকছে। তবে এখন শীতকাল। রোদটাও বেশ মিঠে লাগছিল। গরমের দিন হলে ওরা কিছুতেই টাঙা নিত না। কারণ রাস্তা বেশ খানিকটা দূর। প্রখর রোদে এ ঘোড়া কিছুতেই অতদূর যেতে পারত না।

যশিডি থেকে বদ্রীনাথধাম। টাওয়ারচক পর্যন্ত রাস্তাটা খুবই সুন্দর। এক দিকে সবুজ গাছগাছালি, দূরে পাহাড়ের ক্ষীণ রেখা আর অন্যদিকে ছোট ট্রেনের লাইন চলে গেছে। রাস্তাও বেশ সমান। রোদের তেজ থাকলেও শেষ ডিসেম্বরে বিহারের দুপুরে একটা মিঠে কনকনানি ভাব থাকেই। তার ওপর প্রথম দর্শনে ঘোড়াটাকে যত নির্জীব ভাবা গিয়েছিল—ততটা নির্জীব নয়। বেশ ছুটতে পারে। কানের পাশ দিয়ে তখন কনকনে হাওয়াটা বেশ তীব্র গতিতে বয়ে যাচ্ছিল।

তাতন বোধহয় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে শুভ্র বলল, 'তোর কিন্তু খোকনকে একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'খবর দেবার কী আছে? চেনা জায়গা, অনেকবার এসেছি। অবশ্য আগে বাবা-মার সঙ্গে, এবার একা। কুছ পরোয়া নেই, এবার আমরা অনেক স্বাধীন।'

'তা না হয় হল, কিন্তু জায়গাটার নাম কী যেন বললি?'

'উইলিয়ামস্ টাউন। চারদিকে দেখবি বনেদী বাড়ি আর বাগান। দূরে ডিগারিহা পাহাড়। ভূতটুতের ব্যাপার কী হবে জানি না—কিন্তু প্যাঁড়া আর প্রকৃতির শোভা দেখে তোর দিন কেটে যাবে এটুকু বলতে পারি।'

শুভ্র আর কিছু বলল না। তাতনও বিশেষ কিছু না বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতটা মনে মনে ফিরিয়ে আনছিল। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে উল্টোদিক থেকে কিছু

টাঙা আর প্রাইভেটকার ছুটে ছুটে আসছিল। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে ওরা একসময় টাওয়ারচক পৌঁছে গেল। হঠাৎ তাতন বলল, 'বুঝলি শুভ্র, এক্ষুনি আমরা খোকনের বাড়ি যাব না।'

'তার মানে?'

'এখন বাজে সাড়ে তিনটে। ব্যাপারটা কী হবে বুঝতে পারছিস?'

'কী হবে মানে?'

'আমাদের দেখেই মাসীমা হন্তদন্ত হয়ে পড়বেন। হয়ত বা এখন দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ওনাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে—তার ওপর এখন যা খিদে পেয়েছে—অতক্ষণ মানে রান্নাবান্না সারতে মিনিমাম এক ঘণ্টা। অত দেরী করতে পারব না।'

'তুই কী করতে চাইছিস?'

'টাঙা ছেড়ে প্রথমেই একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খাওয়াদাওয়া সারব। তারপর এদিক-ওদিক কিছু ঘুরে দেখব—জায়গাটা একটু ঘুরেফিরে দেখাও দরকার। তারপর সন্ধ্যের দিকে—'

'কিন্তু সঙ্গে দুটো বড় অ্যাটার্চি আছে মনে রাখিস।'

'তাতে কী—তুই না পারিস আমিই বইব।'

টাওয়ার চকে নেমে ওরা টাঙা ছেড়ে ছিল। টাঙাওয়ালাই বলে দিয়েছিল কোথায় বাঙালি খানা মিলবে। ভাত তরকারী আর মাছের ঝোল দিয়ে দুপুর কাম বা বিকেলের খাওয়া শেষ করে ওরা যখন বেরুল তখন প্রায় সওয়া চারটে। পুর্ব-পরিকল্পনামাফিক ওরা চকের আশপাশ, বাজার, প্যাঁড়া গলি ঘুরে আরো ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে দিল।

'নাঃ, একেবারে খালি হাতে যাওয়া উচিত ন'য়, বলে তাতন কিছু প্যাঁড়া কিনল। তারপর বলল, 'চ, সন্ধ্যে নেমে আসছে, এবার সোজা উইলিয়ামস্ টাউন।'

তাতন যতই কেন চেনাজানার কথা বলুক ও কিন্তু রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। চকের বাঁ দিক ধরে না গিয়ে ও ডানদিকে ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো, খোকনদের বাড়ি তো ঠিক এ দিকটা নয়।'

'তুই রাস্তা গুলিয়েছিস। এদিকে সন্ধ্যেও নেমে গেছে। এক কাজ কর, একটা সাইকেলরিক্সা নিয়ে নে। ওরা রাস্তাঘাট সব চেনে।'

তাতন আর আপত্তি করল না। রিক্সাওলাকে বলতেই ও রিক্শার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। শুভ্র বলল, 'আমরা একেবারে উল্টো দিকে যাচ্ছিলাম।'

চলতে চলতেই রিক্শাঅলা জিজ্ঞাসা করল, 'কার বাড়ি যাবেন আপনারা ?'

'সেনেদের বাড়ি। ব্রজেন সেনকে চেনো তুমি ?'

'ঐ যাদের বাড়ি ভূতের উপদ্রব হয়েছে ?'

'ভূত ?'

'হ্যাঁ বাবু—প্রায় রাতেই আজকাল ভূত আসছে।'

'তুমি দেখেছ নাকি ?'

'না বাবু। তবে শুনেছি সেনবাবুদের বাড়িতে রোজ ভূত চলাফেরা করে। প্রায় রাতেই আদিত্যগড়ের হাবেলি থেকে বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসে।'

'সেটা তো অন্য কেউও বাজাতে পারে—ভূতে বাঁশি বাজাচ্ছে কে বলল ?'

'সবাই বলে। অত রাতে আর কেইবা বাজাবে ?'

রিক্শাঅলার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার কোন মানে হয় না। ও ওর ধারণা আর সংস্কার থেকেই কথাগুলো বলছে। তবে একটা কিছু অন্য রকম ঘটেছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। রাস্তাঘাট সব অন্ধকারে একাকার। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর রিক্শা থামিয়ে লোকটা বলল', 'এই আপনার ব্রজেন সেনের বাড়ি। সামনের মাঠটা পেরোলেই। রিক্শা আর ঢুকবে না।'

সঙ্গে ওদের চার ব্যাটারীর নতুন টর্চ ছিল। যদিও এবড়োখেবড়ো মাঠ তবু চলতে অসুবিধা খুব একটা হচ্ছিল না। তবে শীতটা বেশ জাঁকালো। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওরা সেন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো।

এখনো লোডশেডিং চলছে। তাতন একবার বাড়িটার গায়ে টর্চ ফেলল। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। অন্ধকারে সব কিছু বোঝা না গেলেও অনুমানে বোঝা যায় বাড়িটা সাবেককালের তিনতলা। বাড়ির চারদিকে বাগান, সীমানা পাঁচিল, লোহার গেট আর থামওয়ালা গাড়িবারান্দা বুঝিয়ে দেয় এটা অন্তত সত্তর আশী বছর আগের তৈরী। জমাট অন্ধকারের মধ্যে সবার থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেনবাড়ি একটু ভূতুড়ে পরিবেশও তৈরী করেছে। বাইরে থেকে বাড়ির ভেতরের কোন আলোর আভাসও ছিল না। শুভ্র একটু অস্বস্তি নিয়ে তাতনকে বলল, 'ঐ জন্যেই বলেছিলুম আগে থেকে জানিয়ে আসতে। বাড়িতে কোন লোকজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আচ্ছা খোকনরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি তো ?'

'নাঃ, তাহলে খোকনের টেলিগ্রাম পাওয়া যেত। চল্ ভেতরে গিয়ে ডাকা যাক।'

লোহার গেটটা খোলাই ছিল। ওরা ঠেলে ভেতরে চলে এল। সামনের অংশটা অযত্নের আগাছায় পরিপূর্ণ। গাড়িবারান্দার নিচে এসে দেখল বড় কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দু-তিনবার খোকনের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল। একটু পরে ভেতর থেকে মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বড় গেটটা সামান্য ফাঁক হল। হ্যারিকেন হাতে এক প্রৌঢ়ের মুখ। ওদের দেখতে পেয়ে লোকটি ঈষৎ ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে ? কে আপনারা ? কোত্থেক আসছেন ?'

পরক্ষণেই হ্যারিকেনের আলোয় তাতনকে দেখতে পেয়ে লোকটি বলল, 'কী 'কথা, তাতন দাদাবাবুযে ?'

'এই চলে এলুম,' বলে তাতন বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। পিছনে শুভ্র।

'তা তুমি কেমন আছ তারকদা ?'

'ভালো। একটা খবর দিলে আমি স্টেশনে যেতে পারতুম।'

'ঠিক ছিল না। একরকম হঠাৎই আসা। খোকন কোথায় ? মেসোমশাই, মাসীমা ?'

'সব আছেন। তবে খোকনদাদাবাবুর পা ভেঙেছে।'

'সে কি ! খোকনের পা ভেঙেছে ! কবে থেকে ?'

'দিন দুয়েক হল। বাবু ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। বেমক্কা পড়ে গোড়ালী গেছে।'

হঠাৎ বিরাট ঘেউ ঘেউ শব্দে ওরা দুজনেই চমকে উঠেছিল। একটা বৃহদাকার সাদা অ্যালসেসিয়ান। তারক এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার বগলস ধরে ধমকে চুপ করাল। কিন্তু কুকুরের গোঁ। চিৎকার কমালেও চাপা ক্রোধ নিয়ে গর্‌র্‌র্ করে চলল।

'নতুন এলো নাকি ? গতবার এসে তো এটাকে দেখিনি।'

'নতুন কেন হবে ? ও তো আমাদের সেই কালো।'

'সে কি ? এটা তো ছিল কালো রঙের রেয়ার অ্যালসেশিয়ান।'

তারক ওদের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ততক্ষণে সিঁড়ির ওপর থেকে মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে এল ? কার সঙ্গে কথা বলছিস রে তারক ?'

তারক কিছু উত্তর দেবার আগেই তাতন বলে উঠল, 'আমি মাসীমা, তাতন।'

'ওমা, তাতন, এই রাতদুপুরে—আবার কী হল দেখ,' বলতে বলতে মাসীমা

তরতর করে নিচে নামতে শুরু করলেন। মাসীমার স্বভাবটাই ওরকম। একটুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে বেশী নামতে হল না। তাতনরাই তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গিয়ে প্রণাম করল। তারক ততক্ষণে কালোকে বাঁধতে চলে গেছে। মাসীমার উৎকণ্ঠা তখনও যায়নি, 'হ্যাঁ রে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, কোন দুঃসংবাদ নেই তো?'

তাতন বুঝতে পারল খোকনের চিঠির ব্যাপারে মাসীমার তেমন কিছু জানা নেই। ও বলল, 'না মাসীমা, এমনই চলে এলুম। খোকন কোথায়?'

'আর বলিস না বাবা। কী যে আমাদের এখানে চলছে তোকে কী বলব! একের পর এক লেগেই আছে। খোকন দুদিন হল ঠ্যাং ভেঙে শয্যাশায়ী।'

'হ্যাঁ। তারকদার মুখে শুনলুম। খোকন কোথায়?

'ওপরে। হ্যাঁ রে এ ছেলেটি কে রে? আগে তো দেখিনি।'

'ওকে আর দেখবে কোত্থেকে? ও তো তোমাদের এখেনে প্রথম এল। শুভ্র। আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়ি। কোলকাতায় খোকনের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়ে গেছে।'

এই সব কথার মধ্যেই দপ্‌ করে আলো ফিরে এল। এতক্ষণে সত্যিই যেন প্রাণ এল। বিজলি না থাকাতে আর হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় বাড়িটাকে যথার্থই ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছিল। মাসীমাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচা গেল। যা বাবা তোরা ওপরে চলে যা। খোকনটা একলা একলা রয়েছে। তা হ্যাঁ রে, দিদিজামাইবাবু সব কেমন আছে? কারো অসুখবিসুখ করেনি তো?'

তাতন সংক্ষেপে 'না' বলে তরতরিয়ে ওপরে চলে এল। মাসীমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই বাড়ির নানান প্রশ্ন উঠবে। আর এই মা-মাসীগোত্রীয় মহিলাদের উৎকণ্ঠার বোধহয় শেষ থাকে না!

দোতলার শেষ দিকের একটা মাঝারি আকারের ঘরে খোকন থাকে। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ও একটা বই পড়ছিল। তাতন আর শুভ্রকে দেখতে পেয়ে ওর বিমর্ষ মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। উষ্ণ অভ্যর্থনায় ও হাত বাড়িয়ে দিল, 'ওঃ, তাতন, এসেছিস। বাঁচালি। তোর কোন খবর না পেয়ে ভাবলুম আমার চিঠিটা হয়ত পাসনি! তার ওপর এই দেখ না, কী হাল! এমন উল্টোপাল্টা পড়ে গেলুম!'

তাতন এগিয়ে গিয়ে ওর বিছানাতেই বসে পড়ল। শুভ্র বসল সামনের চেয়ারে। খোকন শুভ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কেমন আছ শুভ্র?'

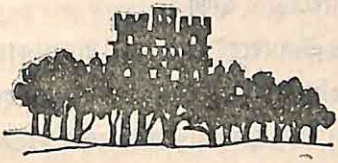
'ভালোই। তোমাকে অবশ্য এখন ও প্রশ্ন না করাই ভালো।'

হাসতে হাসতে খোকন বলল, 'তোমরা এলে, আর আমি—একদম হাঁটা চলা বারণ। কী যে করি!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমি তো আর অপরিচিত কেউ নই। এখন যে কারণে আসা সেগুলো সব ডিটেল্‌সে বল তো। চিঠিতে কী আর সব বোঝা যায়!'

'হবে হবে। অনেকটা জার্নি করে এসেছিস। বিশ্রাম কর। খাওয়াদাওয়া কর। রাতে জম্পেস করে আড্ডা জমানো যাবে। কী বল শুভ্র?'

শুভ্র কেবল মৃদু হাসল।



খিচুড়ি, পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর ভাজাবড়ি দিয়ে মাখা আলুভাতের সঙ্গে কপির বড়া দিয়ে একটা এক্সেলেণ্ট সাপার সেরে তিন কিশোর বসেছে গভীর শলা-পরামর্শে। রাত প্রায় বারোটা। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দুএকটা রাতজাগা কাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। বলাবাহুল্য সমস্ত আলোচনাই চলছিল সেনবাড়িকে ঘিরে যে গভীর ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরী হয়েছে তাই নিয়ে। প্রশ্নটা তাতনই করল, 'তুই চিঠিতে যা লিখেছিলি আর তোর এখানকার বর্ণনা দুটোই এক, তাহলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে কী?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'গুলিয়ে গেলে তো চলবে না। যে কোন ঘটনারই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। আচ্ছা রাজুকাকার মৃত্যুটা তোর কী মনে হয়?'

'বললুম তো,' খোকন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, 'রাজুকাকার ইন্‌সিডেণ্টটা আমার কাছে বিভিন্ন কারণে অদ্ভুত মনে হয়।'

'অর্থাৎ রাজুকাকা আত্মহত্যা করেনি, অ্যাকসিডেণ্টালি জলে ডুবে মরারও কোন যুক্তি নেই, কারণ রাজুকাকার পক্ষে পুকুরে সাঁতার দিতে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাহলে তো একটা কথাই থেকে যাচ্ছে সেটা হল মার্ডার। মানে, কেউ রাজুকাকাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে।'

'ধ্যাৎ', খোকন জোরে জোরে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'নিরীহ এবং নির্বিরোধী এক আত্মভোলা বৈজ্ঞানিককে কে খুন করবে? এখানে কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। রাজুকাকার কোন শত্রু ছিল বলে আমার জানা নেই।'

শুভ্র কথা কম বলে। কিন্তু এবার ও বলল, 'এমনও তো হতে পারে আপাত-দৃষ্টিতে রাজুকাকার কোন শত্রু ছিল না। কিন্তু নিজের অজান্তেই উনি কারুর শিকার হয়ে পড়েছিলেন। হয়ত এমনও হতে পারে রাজুকাকার মৃত্যুতে কেউ লাভবান হচ্ছে।'

খোকন কয়েক সেকেণ্ড শুভ্রর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'রাজুকাকার কী আছে? একমাত্র ঐ ল্যাবরেটারি ছাড়া?'

'বলা যায় না, হয়ত ঐ ল্যাবরেটারির জন্যেই রাজুকাকার অপঘাত মৃত্যু।'

'আমি মানতে পারছি না। আর রাজুকাকা যদি খুন হয়ে থাকেন মানে এটা ধরে নিতে হয়, তাহলে তো বাড়ির লোককেই সন্দেহ করতে হয়। হয় বাবা, নয় মেজোকাকা, নয় তারক অথবা আমি। মেয়েদের মধ্যে মা, কাকীমা, নেলি, মেজকার দুই ছেলে মেয়ে আর আমাদের বড়ির কাজের লোক কল্পনা। তোমার কি মনে হয় শুভ্র এরা কেউ ছোটকাকে খুন করেছেন?'

'আমি তা বলছি না, তবে—'

'বাইরের লোক? রাজুকাকা তো বড় একটা বাইরে বেরুতেন না। বাইরে থেকে কেউ এসে রাজুকাকাকে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে পুকুরে চুবিয়ে মেরেছে এটা বিশ্বাস করতে হবে?'

খোকনের যুক্তি ছিল অকাট্য। কেউই কোন উত্তর দিতে পারল না। ঘরের মধ্যে নেমে এল এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। খোকনই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'তারপর এই সব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা? এগুলোকে কী বলবি?'

'তুই এসব বিশ্বাস করিস?' তাতন জিজ্ঞাসা করল।

'আগে করতুম না, তবে আরো কিছু অলৌকিক কাণ্ড ঘটলে দুদিন পর ভূত বিশ্বাস করতেই হবে।'

'ঠিক আছে, ভূতের ব্যাপারটা এখন থাক। কারণ ভুতুড়ে ব্যাপার বলে যেগুলো বলছিস সেগুলো মোটামুটি একটা ধরে নেওয়ার ব্যাপার। মেজোকাকার মাথায় ডাব ভেঙে পড়া, নেলির কাঁধে সুড়সুড়ি, অন্ধকারে রাজুকাকার গাউন গায়ে কারো হেঁটে যাওয়া, অথবা মেসোমশাই মানে তোর বাবার, ও হ্যাঁ, কথাটা

জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। মেসোর খাটে যেদিন কঙ্কালটঙ্কাল ছিল সেদিন কি আলো ছিল ?'

'তার মানে ?'

'মানে, তখন কি লোডশেডিং চলছিল ?'

'লোড শেডিং', খোকন কিছুক্ষণ ভাবার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, লোডশেডিং বোধহয় চলছিল—কারণ তারকদার হাতে হ্যারিকেন জলছিল—'

'তবেই দেখ্, আবছা আলো অন্ধকারে—'

তাতনের সন্দেহটাকে খোকন কোন পাত্তাই দিল না। বলল, 'অ্যাবসার্ড, আর কারো ভুল হলেও হতে পারে—কিন্তু বাবা অযথা একটা কিছু দেখে ভুল দেখে সীন করবেন না। তার ওপর প্রায় রাত্রে বাঁশীর আওয়াজ—'

'হুঁ,' বলে তাতন চুপ করে গেল। মানুষের মধ্যে একবার ঢুকে যাওয়া ভূতের বিশ্বাস যুক্তিতর্ক দিয়ে কাটানো মুশকিল। তাতন আর ও-পথে গেল না। হঠাৎ ও-প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজুকাকার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু তোর জানা নেই, তাই তো ?'

'দূর! উনি ওসব নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন কেন ?'

'রাজুকাকার বন্ধুবান্ধব, মানে, এখানে কারো সঙ্গে ওঁর কোন ইনটিমেসি ছিল কী ?'

'রাজুকাকা একা থাকতেই ভালবাসতেন। বন্ধুবান্ধব বলে তেমন কেউ ছিল না, তবে—'

'থামলি কেন, বল ?'

বলাই জেঠুর সঙ্গে রাজুকাকু প্রায়ই কথাবার্তা বলতেন। এমনও হয়েছে দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টাও দুজনে কথাবার্তা বলে কাটিয়েছেন।'

'বলাই জেঠু কে ?'

চিঠিতে লিখেছিলাম বোধহয় ভুলে গেছিস—উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। আমাদের বাড়ির পূজাআর্চাও করেন আবার বাবা কাকার সঙ্গে আড্ডাও দেন। তবে ওনার একটা প্রফেসন আছে। উনি জ্যোতিষী। এখানে ওনার একটা অফিসও আছে। রোজ সন্ধ্যেবেলা বসেন। লোকের ঠিকুজি দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দেন।'

'ভারী আশ্চর্য!' বলে তাতন বাইরের অন্ধকারে মুখ ফেরালো।

খোকন বলল, 'কেন, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?'

'রাজেন সেন একজন বৈজ্ঞানিক। যুক্তিতর্ক ছাড়া তিনি এক পাও চলেন না। এক কথায় তাঁকে নাস্তিক বলা যায়। তিনি জ্যোতিষীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন? আলোচনাটা কিসের?'

'কে জানে? একমাত্র ঐ লোকটাকেই দেখেছি রাজুকাকুর ঘরে অবলীলাক্রমে চলে যেতে, অবশ্য এ বাড়িতে সব ঘরেই ওঁর অবাধ যাতায়াত।'

'বলাইবাবু লোক কী রকম?'

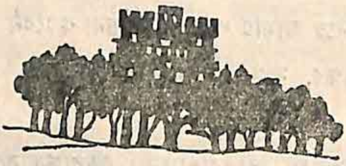
'একটু ভারিক্কি। আর অহঙ্কারীও বলে মনে হয়।'

'তার মানে বলছিস পাত্তা দেবে না।'

'তোকে দেবে কিনা জানি না। আমাকে দেয় না।'

'কিন্তু রাজেন সেন সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে ঐ লোকটাকেই পাকড়াও করতে হবে। দেখা যাক! নে, শুয়ে পড়। তোর অসুস্থ শরীর। বেশী রাত জাগা ঠিক হবে না।'

আলোটা নিবিয়ে যে যার শুয়ে পড়ল।

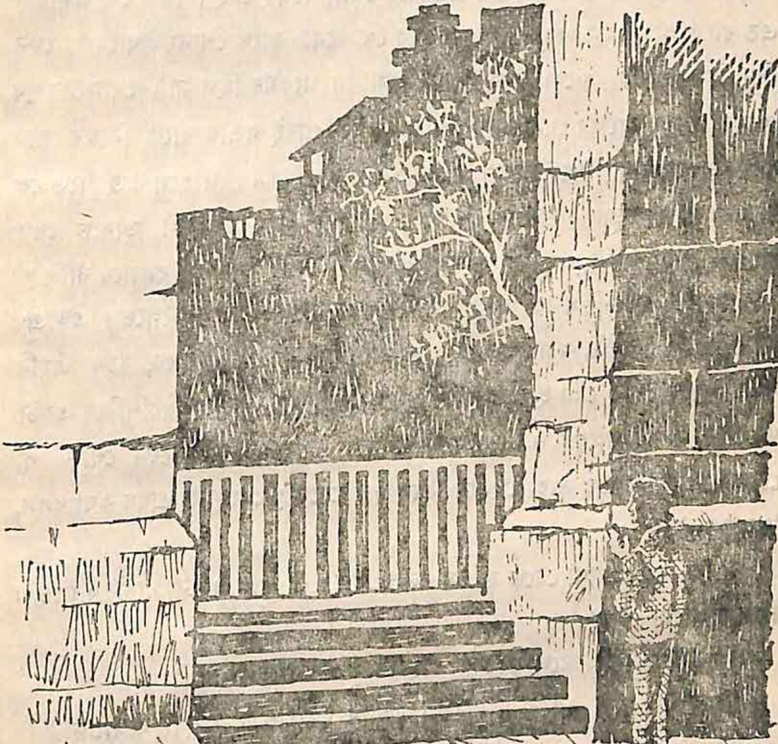


রাত তখন কটা হবে কে জানে! একটা অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল তাতনের। বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই চোখ খুলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। নিকষ কালো অন্ধকারে সব কিছু ডুবে আছে। শুভ্রটা ঘুমলে নাক ডাকায়। ওর নাক মাঝে মাঝেই ডেকে চলেছে। ও আর শুভ্র শুয়েছিল এক খাটে। একটু দূরে অন্য খাটে খোকন। চট্ করে তাতন বিছানা ছেড়ে উঠল না। অস্বস্তিটা কেন, তাই বোঝার চেষ্টা করল। চুপচাপ অন্ধকারে শুয়েও রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার থাকতে থাকতেই ওর মনে হল কিসের একটা সুর যেন কোথা থেকে ভেসে আসছে।

একে শীতকাল। তার ওপর চারদিকে প্রচুর গাছপালা থাকার জন্য জায়গাটাকে বেশ পাড়াগাঁ টাইপ বলে মনে হয়। অল্প রাতেই মনে হয় বেশ রাত হয়েছে। অবশ্য এখন রাত কত বোঝার উপায় নেই। হাতঘড়িটা রয়েছে খোকনের মাথার কাছে, টেবিলে। রাত যাই হোক না কেন, তাতনের ভয়ডরটা বরাবরই কম। ইচ্ছে করলেই ও উঠতে পারে। কিন্তু উঠল না। শুয়ে শুয়ে সুরটাকে উপলব্ধি

করার চেষ্টা করল। সত্যিই কি ওটা কোন সুর না তার মনের কল্পনা ? নাঃ, সত্যিই ওটা সুর। কী সুর, কী রাগ, তা ওর জানা নেই। ওর এই বয়েসে তা জানা সম্ভব নয়। তবে গান বা বাজনা নয়। হ্যাঁ, বাঁশী। বাঁশীর মধুর সুর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটতে কিন্তু বেশীক্ষণ সময় লাগল না। বাঁশীর আওয়াজ শুনেই ওর মনে পড়ে গেল বাঁশী নিয়ে ভূতুড়ে প্রচার। শুভ্র আর খোকন দুজনেই



ঘুমচ্ছে। নিঃশব্দে ও বিছানা ছেড়ে উঠল। আলো জালাবার কথা মনে হলেও আলোটা জ্বালালো না। আস্তে আস্তে খিল খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিঃসীম অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। কোথাও এতটুকু আলোর রেশ পর্যন্ত নেই। এমন কি দূরে যেন রাস্তার আলো নেভানো। নিশ্চয় লোডশেডিং চলছে। এখানে

লোডশেডিংটা বোধহয় একটু বেশী। সময় অসময় নেই। গেলেই হল। নিস্তব্ধ টানা বারান্দা। তার ওপর কনকনে বিহারী ঠাণ্ডা। নাকের ডগাটা ক্রমশ বরফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না তাতনের। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ও বোঝার চেষ্টা করছিল বাঁশীর আওয়াজ আসছে কোনখান থেকে। একবার মনে হচ্ছিল পশ্চিমদিক থেকে। একবার মনে হচ্ছিল উত্তরের ফাঁকা মাঠের মাঝ থেকে ভেসে আসছে সুরটা। কিন্তু এটা যে বাঁশীর আওয়াজ, কিছুক্ষণ পরেই তাতনের মনে হল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কে বাজায়? এত রাতে কার এমন অদ্ভুত শখ? যতদূর খোকনের কাছে শোনা এখানে রাজেন সেন ছাড়া আর কারো বাঁশীর প্রতি অনাবিল আকর্ষণ ছিল না। খোকনের মুখ থেকেই শোনা, রাজেন সেন জীবিত থাকাকালীন প্রায়ই গভীর রাতে নিজের মনে বাঁশী বাজাতেন। কিন্তু রাজেন সেন তো মারা গেছেন। তাহলে এত রাতে কে বাজাবে বাঁশী? ভূতে? রাজেন সেনের প্রেতাত্মা? ধ্যাৎ এসব কী ভাবছে সে? তা কখনও হয় নাকি? ভূতেই তার বিশ্বাস নেই। তার ওপর সে বাজাবে বাঁশি?

কতক্ষণ কেটেছিল কে জানে? বাঁশীর সুরটা তখনও বেজে চলেছে। একাগ্র-চিত্তে তাতন উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কী হতে পারে, ঠিক এমনি সময়ে কাঁধে কার যেন হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সে। শরীর শিরশিরিয়ে একটা ভয় উঠে আসার আগেই ও পিছন ফিরে তাকাল। খোকন কখন যেন খোঁড়া পা টেনে টেনে নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে! খোকনই প্রথম কথা বলল, 'শুনছিস?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে তাতন বলল, 'হ্যাঁ। সত্যিই একটা বাঁশী বাজছে। কিন্তু বাজাচ্ছে কে?'

'এখানকার সবাই বলে ভূতে। আর সে ভূতটা রাজুকাকার।'

'কিন্তু আমরা তা বলছি না। কেউ একজন রক্তমাংসের মানুষই বাজাচ্ছে।'

'হতে পারে! কিন্তু কে? কেন? তার উদ্দেশ্যই বা কী?'

'হয়ত কোন উদ্দেশ্য নেই—এমনিই।'

'কিন্তু রাজুকাকা মরার আগে তো এমন করে অন্য কেউ বাজাতো না।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে একটাই, যে বাজাচ্ছে সে প্রমাণ করতে চাইছে রাজু-কাকার ভূত এখনও চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কিন্তু কেন? সত্যিই যদি অলৌকিক কিছু না হয়—তাহলে কী তার উদ্দেশ্য?'

'রাজুকাকার ভূতকে এস্টাবলিশ করা।'

'অর্থাৎ তুই বলতে চাইছিস—রাজুকাকার ভূতটা থাকলেই তার লাভ ?'

'এ ছাড়া আর কী বলব বল ? নইলে বলতে হয় সত্যিই রাজুকাকা ভূত হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। আচ্ছা খোকন, আওয়াজটা ঠিক আসছে কোত্থেকে বুঝতে পারছিস ? একবার মনে হচ্ছে দূরের ঐ পাহাড় থেকে আবার মনে হচ্ছে এই সামনেই কোথাও বসে কেউ বাজাচ্ছে। আচ্ছা এদিকে মানে এবাড়ির বাঁদিকে পাহাড়ের নিচে একটা দুর্গ মত বাড়ি দেখেছিলুম এর আগে এসে। ওটা কী ?'

'ওটা একটা দুর্গের মতোই। তুই ধরেছিস ঠিকই। এখন অবশ্য দুর্গ-টুর্গ কিছু নয়। পোড়ো, প্রায় ঐতিহাসিক ভাঙ্গাচোরা বাড়ি বলতে পারিস।'

'লোকজন কেউ থাকে ?'

'পাগল ! ঐ পোড়ো দুর্গে কে থাকবে ? তবে ওটার একটা ইতিহাস আছে।'

'কী রকম ?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী। পরে একদিন বলব। তবে এটুকু বলা যায় ওখানে বর্তমানে কোন মানুষ থাকতে পারে না। বিছে, সাপ, বাদুড় এদের একটা ভালো আস্তানা। সত্যিই যদি কোন মানুষ বাঁশী বাজায়, তাও সে ওখানে গিয়ে বাজাবে না। আর কিছু না হোক সাপ বা বিছের কামড়ে সে মারা যাবে।'

'তুই কোনদিন গিয়েছিস ?'

'পাগল ? মা বাবা জানতে পারলে আমার আর একটা পায়ের হাড় গুঁড়ো করে দেবে।'

'এমনি কোন কৌতূহলও হয়নি ?'

'না। প্রয়োজনই বা কী ?'

'তা বটে। আমি একদিন যাব।'

'মানে ?'

'ঐতিহাসিক পোড়ো বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'তাতন, তোকে ডেকে ভুল করেছি। আর তোকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। তুই কালই বাড়ি চলে যা।'

'মানে ?'

'ভূতুড়ে না হোক, সাপ বিছের আড্ডাখানায় তোমার যাওয়া চলবে না।'

তাতন কিছু না বলে সামান্য হাসে। ওর হাসিটা অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। কয়েক সেকেণ্ড পর ও বলল, 'তুই খুব ভীতু ! যাকগে, এখন অনেক রাত

হল। তোর আবার ভাঙ্গা পা। মাসীমা দেখলে আমায় কথা শুনিয়ে শুনিয়ে শেষ করে দেবেন। তবে দুর্গের গল্পটা কিন্তু কাল শোনাবি।'



ডিসেম্বরের শেষে সাধারণত বৃষ্টি টৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিচিত্র প্রকৃতির খেয়াল। সকাল থেকেই আকাশটা ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। তারপর দুপুর থেকে শুরু হল পিটপিটে ফোঁটা। জোরে নামল বিকেলের দিকে। তাতনের ইচ্ছে ছিল সেদিনই দুর্গটার দিকে যাওয়ার। দুর্গটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ওটা কেবলি কাছে টানে। বিশেষ করে তাতনের মত ডানপিটে ছেলেদের। অবশ্য খোকনের ভীষণ আপত্তি। ও চায় না এখানে এসে তাতন কোন রকম দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। তাতনের মা, মানে ওর বড় মাসীর কাছে ও মুখ দেখাতেই পারবে না তাহলে।

সারাদিন প্রায় বাড়িতে বসেই কেটে গেছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা জোরে নামতেই বেরুনোর আশা জলাঞ্জলি দিয়ে ওরা গুছিয়ে বসল খোকনের ঘরে। তারকদার তৈরী বাড়িতে ভাজা বেগুনী আর ফুলকপির বড়া, সঙ্গে আচারের তেলে মাখা মুড়ি নিয়ে বসেছিল তিনজন। খোকন একটা বেগুনী তুলে নিয়ে কামড় দিতে দিতে শুরু করল গল্প। গল্পটা দুর্গের প্রাচীন ইতিহাস। নেই কাজের দিনে, বাইরে বৃষ্টি, জম্পেস ডিসেম্বরী ঠাণ্ডা আর মুড়ি তেলেভাজার সঙ্গে প্রাচীন দুর্গের পুরনো ইতিহাস। এর মেজাজেই আলাদা।

'কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না', বেগুনী চিবোতে চিবোতে ধীরে ধীরে খোকন বলল, 'সবই খাপছাড়া ভাবে শোনো। কিছুটা বাবার মুখে, কিছুটা লোকপরম্পরায়। আচ্ছা ঠিক আছে, মোটামুটি গোড়া থেকেই বলি। আমাদের এ জায়গাটা বিহারের মধ্যে পড়লেও এককালে ছিল বাঙালীপ্রধান। এখনও প্রচুর প্রবীণ বাঙালির দেখা পাবি। বহু প্রাচীন বাড়ি পাবি তারা সবাই বাঙালি সম্পন্ন গৃহস্থ। আসলে জায়গাটা খুবই স্বাস্থ্যকর। বাংলাদেশের বহু ধনী বাঙালি এখানে তাঁদের দু একটা বিশাল বিশাল বাড়ি তৈরী করে রাখতেন। এখানে আসতেন শীতকালটা কাটাবার জন্যে। আসলে এগুলো ছিল তাঁদের স্বাস্থ্যনিবাস। ঐ যে

দুর্গটা দেখছিস ওটা ছিল পূর্ব বাংলার এক জমিদার, আদিত্যনারায়ণের। শোনা যায় উনি ছিলেন বেশ শৌখিন লোক।'

হঠাৎ তাতন একটা প্রশ্ন তুলল, 'তুই তো বললি আদিত্যনারায়ণ শৌখিন লোক ছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে দুর্গ টাইপের বাড়ি তৈরী করার কী দরকার? বড়-সড় কোন মহল বানালেই তো হত।'

তাতনের দিকে একবার তাকিয়ে খোকন বলল, শোনা যায় ঐ গড়ের মধ্যে মাটির নিচে কোন এক গুপ্ত কক্ষে ওনার নাকি প্রচুর ধনসম্পত্তি লুকনো আছে বা ছিল। এ ছাড়া আরো হয়ত কিছু ব্যাপারট্যাপার ছিল।'

'আরো ব্যাপার বলতে?'

'আদিত্যনারায়ণের খুব সম্ভবত বেশ কিছু শত্রু ছিল। আসলে কী জানিস তখনকার কালের এই সব জমিদারেরা লোক হিসেবে খুব একটা ভালো ছিলেন না। সারাজীবনে কিছু না কিছু কুকর্ম এঁরা করতেনই। শত্রু থাকাই স্বাভাবিক। তাই যে কোন কারণেই হোক আদিত্যনারায়ণের নিশ্চয় সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল। বছরের বেশীরভাগ সময় এখানেই কাটাতেন আর বড়-একটা দুর্গের বাহিরে বেরুতেন না। অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি।'

'কী রকম?'

'আদিত্যনারায়ণ খুন হয়েছিলেন। ওঁর দুর্গের মধ্যেই। দুর্গের এলাকাটা বিশাল। চারিদিক পরিখা দিয়ে ঘেরা। মূল বাড়িটার চারপাশে ছিল বিশাল বাগান। আদিত্যনারায়ণ সেখানেই প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন। একদিন সেখানেই এক গাছতলায় পাথুরে বেদীর ওপর ওঁর গলাকাটা রক্তাক্ত দেহটা পাওয়া যায়।'

'এ নিয়ে কোন তদন্ত হয়নি,' বেশ গোয়েন্দাসুলভ ভারিক্কি চালেই তাতন জিজ্ঞাসা করল।

'হয়েছিল আদিত্যনারায়ণের ভাই সূর্যনারায়ণ নাকি দাদাকে খুন করেন—টাকাকড়ির লোভে। অনেকদিনের পুরনো ব্যাপার। এখন আর লোকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে আদিত্যগড় তার পর থেকেই ফাঁকা। এখন তো ভূতুড়ে বাড়ি।'

'কেন? আদিত্যনারায়ণের আর কেউ ছিল না?'

'উনি অবিবাহিত ছিলেন। শোনা যায় ওঁর ঐ ভাই ছাড়া আর তেমন কেউ ছিল না। আদিত্যনারায়ণের মৃত্যুর পর সেই ভাই এখানে এসে উঠেছিলেন।

কিন্তু খুনী সাব্যস্ত হবার পরই নাকি উনি ফেরার। তিনি ধরা পড়েছেন কী পড়েননি তা জানি না।'

'এসব কতদিন আগের কথা?'

'বাবা বলেন বছর কুড়ি-পঁচিশ তো হবেই।'

'তার মানে কুড়ি-পঁচিশ বছর ওই দুর্গে আর কেউ থাকেন না?'

'হ্যাঁ, তবে সেই সময় বেশ কিছুদিন ধরে ঐ গড় থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসত।'

'কেন?' মানে বাঁশী ছাড়া অন্য কিছু নয় কেন?'

'আদিত্যনারায়ণ নিজে ভালো বাঁশী বাজাতেন। উনি বেঁচে থাকতে এখানকার অনেকেই বাঁশীর আওয়াজ পেতেন।'

'অর্থাৎ বলতে চাইছিস আদিত্যনারায়ণের মৃত্যুর পরও তার প্রেত এখানে আসত?'

হঠাৎ শুভ্র বলে উঠল, 'ধুস্...তা আবার হয় নাকি?'

তাতন মৃদু হাসতে হাসতে বলল, 'জগতে কত কী যে ঘটে যা সাদা মাথায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। আসলে আমাদের জ্ঞান খুবই কম...সব সময় সব কিছুর মানে কী বোঝা যায়?'

'এ কথা তুই বলছিস?'

'আমি কিছুই বলছি না। তবে একটা ব্যাপার বোঝানো হচ্ছে যে অপঘাতে কারো মৃত্যু হলেই—ধর্মের বাঁশী বাজতে আরম্ভ করে।'

তাতনের কথা শুনে খোকনও বলল, ভূতের ব্যাপারে আমারও কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ মানে ছোটকা মারা যাবার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে—এখন তো ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কিছু মেনে নিতে হচ্ছে।'

শুভ্র বলল, 'ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়ালো? ভূতেদের স্টকে একটা বাঁশী আছে। বাজাচ্ছে দুটো ভূত। তারপর যখনই তাদের দল বৃদ্ধি হয় তখনই বাঁশী বেজে ওঠে। খোকনের ছোটকা আর আদিত্যনারায়ণ।'

আচ্ছা বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে আর কারো অপঘাত মৃত্যু হয়নি?' তাতন জিজ্ঞাসা করল।

'কে জানে! তবে এর মধ্যে কেউ বাঁশীর সুর শোনেনি।'

'দুর্গটাতে যাওয়া দরকার। খুবই দরকার। কিন্তু খোকনের বেজায় আপত্তি।'

'ভূত ধরতে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যেখানে ভূতের থেকেও বড় ভয় সাপ আর বিষাক্ত বিছে, সেখানে—তোরা বুঝতে পারছিস না, অভিযানটা অত্যন্ত রিস্কি হয়ে যাবে।'

'তাহলে আর এলুম কেন,' এবার তাতনের কণ্ঠে বেশ বিরক্তি, 'যে কোন অভিযানেই রিস্ক থাকবে। আর রিস্ক ছাড়া কিছুই গেইন করা যায় না!'

'কিন্তু আমি তো খোঁড়া হয়ে পড়ে আছি।'

'তোর যাবার কোন দরকার নেই। বরং তুই গেলেই হৈচৈ বাধবে। আমি আর শুভ্র একদিন ঘুরে আসব।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় খোকন বলল, 'ঠিক আছে, একদিনই যাবি। তাও সকালের দিকে। আর বাড়ির ভেতরে যাবার কোন দরকার নেই। তাছাড়া তুই তো এখানে এসেছিস রাজুকাকার ব্যাপারটা একটু খোঁজ খবর নিতে। দুর্গরহস্য নিয়ে তোর মাথা ঘামানোর কী আছে? আদিত্যনারায়ণ খুন হয়েছেন কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে আর রাজুকাকার সঙ্গে দুর্গের কোন সম্পর্কই নেই।'

শুভ্র আবার টিপ্পনী কাটল, 'ভূতেদের মধ্যে আমি শুনেছিলুম আঁতাত বেশী হয়।'

খোকন শুভ্রর রসিকতা ঠিক মত ধরতে না পেরে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ শুভ্র?'

'বিশ-পঁচিশ বছরের পুরনো ভূত—এতদিনের পর নতুন সঙ্গী পেয়েছে—তোমার রাজুকাকাকে—তাই হয়ত মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছেন।'

খোকন হেসে ফেলল, বলল, 'বুঝেছি। দুর্গভ্রমণ তোমরা না করেই ছাড়বে না। কিন্তু প্লীজ আমাকে বিপাকে ফেলো না।'

সেদিন আর কথাবার্তা তেমন এগুলো না। তবে ওরা দুজন যে দুর্গে যাবে এটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল।



ইচ্ছে থাকলেও প্রায় চারদিন কোথাও বেরুনো গেল না। একটানা ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। তাতনরা যা গরমের জামা কাপড়

এনেছিল তাতেও শীত আটকানো যাচ্ছে না। খোকনের মা দুটো ভারী কম্বল বের করে দিয়েছিলেন। বৃষ্টির জন্যে বাইরে বেরুতে না পেরে তাতন আর শুভ্র খুব বোর ফীল করছিল। ওদের বেশীর ভাগ সময় কাটে খোকনের ঘরে। নেলীকে সঙ্গে নিয়ে চারজনে ক্যারাম পিটে পিটে আঙুলের ডগা ব্যাথা করে ফেলেছিল। কাঁহাতক আর ক্যারাম নিয়ে বসে থাকা যায়! তাতন ঠিক করেছিল পরের দিন বৃষ্টি পড়লেও বেরুবে। একঘেয়েমীর চুড়ান্ত। এমন সময় হঠাৎ নেলী এসে জানাল বৈঠকখানায় জ্যোতিষ জেঠু এসেছেন। ওদের ডাকছেন। শুনেই খোকনের বিস্ময়। বলাই জেঠুতো ছেলে ছোকরাদের তেমন পাত্তা দেন না। সর্বদাই একটা রাজসিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে ছোকরাদের এড়িয়ে চলেন। সেই জেঠু কিনা তাতনকে ডাকছেন? নেলীকে ও জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ঠিক শুনেছিস?'

'হ্যাঁ গো—বাবার মুখে তাতনদার সব কথা শুনে উনি তাতনদাকে দেখতে চাইছেন।'

তাতন বলল, 'আমার সব কথা শুনে মানে? মেসোমশাই কী বলেছেন?'

নেলী বরাবরই গিন্নীবান্নিদের মত কথা বলে। ও বলল, 'জানিনা বাপু, বাপ-জেঠাদের কথা, সব সময় কী আমার সামনে হয়? নিজে গিয়েই শোনো।'

অতএব যেতে হল। তাতনও অবশ্য বলাই জেঠুর সঙ্গে আলাপ করতেই চেয়েছিল, কারণ রাজেন সেনের সঙ্গে এই লোকটারই কথাবার্তা হত। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে খোকন, তাতন আর শুভ্র গেল বৈঠকখানায়।

সাবেকী বিশাল তক্তার ওপর বসেছিলেন ব্রজেন সেন মানে খোকনের বাবা। ওঁর পাশে খোকনের মা। তক্তার সামনে কয়েকটা চেয়ার পাতা। তারই একটায় বসেছিলেন বলাইবাবু। তাতনরা ঘরে ঢুকতেই ব্রজেনবাবু বললেন, 'এসো এসো, তাতন এস। শুভ্র এসো। তুই আবার নিচে নামলি কেন খোকা?'

উত্তরটা তাতনই দিল, 'খোকন খুব বোর হচ্ছিল মেসোমশাই।'

'বুঝি, কিন্তু গোড়ালী ভেঙ্গেছে তো। ওর নিচে নামাই উচিত না।' তারপর বলাইবাবুর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝলে বলাইদা, এই হল তাতন। আমার বড় শালীর ছেলে। খুব ইনটেলিজেণ্ট। শুধু তাই নয়' ও একটি ছোটখাটো গোয়েন্দা।'

তাতন কিছু না বলে একটু লাজুক মুখে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। খোকন আগেই বসেছিল। শুভ্রও বসল।

'খুব গোয়েন্দা গল্প পড়, তাই না?'

বেশ গুরুগম্ভীর আর মাতব্বরি চালে বলাইবাবু প্রশ্ন করলেন। বলা বাহুল্য

তাতনের উদ্দেশ্যে। তাতন এবার সরাসরি বলাই বাবুর দিকে তাকাল। মাথার সামনের দিকটা টাক পিছনে লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নামানো। চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। তীক্ষ্ণ নাক। সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়িতে ভর্তি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। গায়ের রঙ এককালে উজ্জ্বল ছিল। এখন বয়স বাড়াতে রঙের দীপ্তি কিছু কমেছে। গায়ে বেশ মোটা ভাগলপুরী চাদর। চেয়ারের ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসেছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় ৫০/৫৫। কপালে লম্বা লাল টিপ কাপালিকদের মত। চোখ লালচে। প্রশ্নটা করে কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'পড়াশুনো কর ?'

তাতন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'কী পড় ?'

'সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারী দোব।'

'এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন থাকা ভালো, তবে হায়ার সেকেণ্ডারী খুব টাফ্।'

বলাইবাবুর গুরুজনি হাবভাব বোধ হয় শুভ্রর ভালো লাগছিল না। ও বলল, 'তাতন বরাবরই ফাস্ট সেকেণ্ড হয়।'

'হুঁ ! তা গোয়েন্দাগিরির ভূত মাথায় চাপালো কে ?'

খুব শান্ত স্বরে তাতন বলল, 'কেউ না।'

'নিজে নিজেই গোয়েন্দা হবে ? এর জন্যে আলাদা ট্রেনিং নিতে হয়। আশ-পাশের সব মানুষকে স্টাডি করতে হয়। তা জানো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হুঁ। এই যে আমায় দেখে কিছু বলতে পার ? আমি লোকটা কেমন ? কী করি ?'

'আপনার সম্বন্ধে আমি কিছু শুনেছি। খোকনের কাছে। তাই বললে মনে হবে রিপিট করছি।'

'হুঁ। তা এখানে কী বেড়াতে এসেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খোকনের মা আমার ছোটমাসী হন।'

'তোমার ভালো নাম কী ?'

'আজ্ঞে বাপ্পাদিত্য সেনগুপ্ত। আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ?'

'প্রশ্ন ? কর ?'

'আপনি ভূত দেখেছেন ?'

'ভূত ? ও ভূত। শুনেছ সবকিছু ? না দেখিনি। তবে তোমার মেসোমশাই তো দেখেছেন।'

'আপনি দেখেছেন নাকি মেসোমশাই ?'

ব্রজেনবাবু এবার সহসা কোন জবাব না দিয়ে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমি যা দেখেছি তাকে ভূত বলব কিনা জানি না। কারণ ভূত বলতে আমরা যা বলি তা একটা সিম্বল। ভূতের তো ফিগার থাকে না। থাকার কথাও নয়। 'আমি একটা কঙ্কাল দেখেছিলাম। কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা আজও পাইনি। ব্যাপারটা গোলমেলে।'

'আর এই বাঁশীর আওয়াজ, যেটা প্রায়ই রাতের বেলা ভেসে আসে ? সেটাও কী ভূতুড়ে ব্যাপার ?'

'বলতে পারব না, তবে রাজেন মারা যাবার পর থেকেই এসব হচ্ছে।'

'কিন্তু মেসোমশাই, আজকের দিনেও কী এসব মানতে হবে ?'

'মানতে আমিও চাই না, কোনদিনও চাইনি, কিন্তু বলাইদা, তুমি কী বল ?'

'এরা সব আজকালকার ছেলে ছোকরা, এরা মানবে কেন ? তবে রাজুর হাত দেখে আমি তো আগেই বলেছিলুম ওর একটা বিরাট ফাঁড়া আসছে। জীবন-মরণ সমস্যা।'

'আপনি আগেই ফোরকাষ্ট করেছিলেন ?'

'হুঁ, রাজু অবশ্য এসব পাত্তা দিত না। কিন্তু হাতে নাতে ফলে গেল। নিয়তি, নিয়তি কে ন বাধ্যতে।'

'সে তো বটেই। আচ্ছা বাঁশী কী অন্য কেউ বাজাতে পারে না ?'

বলাই বাবুর চোখে কেমন যেন বিরক্তির ছায়া নেমে এল। ভ্রূ কুঁচকে উনি তাতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই শীতের রাতে, বিহারের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার, আদিত্যগড়ের দুর্গের মাথায় বসে কোন্ আহাম্মুক বাঁশী বাজাবে ? হয় সে পাগল নয় অলৌকিক কিছু। আর এটা তর্কের ব্যাপার নয়। উপলব্ধি করতে হয়।'

'না না আপনি রাগ করছেন কেন ? আমি একটু কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই বলেছিলাম। আচ্ছা, বাঁশীর আওয়াজটা যে আদিত্যগড় থেকেই আসছে এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত ?'

'তুমি কী বলতে চাইছ ছোকরা ? আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কী করছি।'

'আপনি এভাবে নেবেন না, আমি তো এখানকার কিছুই জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।'

'ব্রজেন অবশ্য তোমার সম্বন্ধে বলছিল, ভবিষ্যতে তোমার গোয়েন্দা হবার বাসনা। সেটা নিয়েই থাক। আবার ভূতপ্রেত নিয়ে ঠাট্টা মস্করার কী দরকার ?'

তাতন এবার গম্ভীর হয়ে গেল। ও বলল, 'বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আমি কখনও ঠাট্টা মস্করা করিনা। আপনার বিশ্বাসকে ভাঙ্গারও কোন ইচ্ছে আমার নেই। সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে কতটা ভৌতিক কাণ্ড আছে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলুম।'

'এর মধ্যে অন্য কিছু ব্যাপার আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে নাকি ?

'থাকতেও তো পারে।'

'কী রকম ?'

'অত ভেবে দেখেনি। তবে রাজুকাকার মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক মাথায় মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।'

হঠাৎ যেন চিড়বিড়িয়ে উঠলেন বলাই বাবু। উনি বললেন, 'রাজুর মৃত্যু স্বাভাবিক তোমায় কে বলেছে ? ওটা ড্রাউন্ড্ কেস।'

'প্রশ্নটা সেখানেই। রাজুকাকা কী জলে ডুবে যেতে পারেন ?'

'জলে ডোবা কেস কী পৃথিবীতে এই প্রথম ঘটল ?'

'না, তা নয়, তবে রাজুকাকাতো সাঁতার জানতেন না, তাহলে তিনি হঠাৎ পুকুরে যাবেন কেন ?'

'বেঁচে থাকলে জিজ্ঞাসা করা যেত। এখন আর সে কথার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।'

'আপনি যদি রাগ না করেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'ভাল প্রশ্ন হলে উত্তর দিতে আপত্তি নেই ?'

'খোকনের মুখে যতটুকু শুনেছি—রাজুকাকা কারো সঙ্গেই মেলামেশা করতেন না। একমাত্র আপনি ছাড়া।'

'তাতে কী ?'

'শুনেছিলুম, উনি কী একটা দারুণ কিছু আবিষ্কার করেছিলেন—সেটা কী ?'

'কোন বৈজ্ঞানিকই তার আবিষ্কারের কথা আগে থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক জানিয়ে বেড়ায় না।'

'ঠিক কথা। তবে আপনার সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল—যদি বলে থাকেন ?'

'না, আমায় সে কোনদিনও তার বিজ্ঞান আর আবিষ্কার নিয়ে কিছু বলেনি। তা রাজুর জলে ডোবার মধ্যেও কী কোন রহস্য আবিষ্কার করে ফেললে?'

'এটা তো প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল জলে ডোবা কেস। এর মধ্যে রহস্যের কীই থাকতে পারে? কিন্তু যদি কিছু থেকে থাকে?'

আবার বিরক্তি এবং ভ্রূকুটি বলাইবাবুর। বিরক্তি নিয়েই উনি বললেন, 'অল্প বয়সে বেশী গোয়েন্দা কাহিনী পড়লে এই হয়। দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে রহস্য রহস্য গন্ধ। তা অন্য আর কী থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'এমন কী হতে পারে না, রাজু কাকার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—কেউ ওকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে।'

'কারণ?'

'ঐ আবিষ্কারের লোভে।'

'তুমি নিতান্তই নাবালক। আবিষ্কারের বিষয়টি হস্তগত করার জন্যে কেউ বৈজ্ঞানিককে খুন করবে না। বরং তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার কাছ থেকে আবিষ্কারের ফর্মুলাটি হাত করার চেষ্টা করবে।'

'আপনার যুক্তি নিশ্চয় অকাট্য।'

'তাছাড়া পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী এটা জলে ডোবা কেস, অন্য কিছু নয়। ব্রজেন আমায় এবার উঠতে হবে। যা বললুম সেটা করে ফেলো। শুধু তোমাদের জন্যে না রাজেনের অতৃপ্ত আত্মার শান্তির জন্যেও একটা প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার। গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডি দিয়ে এলেই দেখবে এই সব ভূতের উপদ্রব কমে গেছে। ঠিক আছে আজ তাহলে আমি উঠি।'

কারো উত্তরের তোয়াক্কা না করেই বলাইবাবু উঠে পড়লেন, তারপর 'বৌমা চলি' বলেই ওনার নাটকীয় ভাবে প্রস্থান।

ঘরের আবহাওয়াটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল। সেটা কাটাবার জন্যেই খোকন বলল, 'তাতনের কথাটা কী একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় বাবা?'

ব্রজেনবাবু চট্ করে কোন উত্তর দিলেন না। নিজের মনেই কিছু যেন ভাবছিলেন। খোকনের মা এতক্ষণ কিছু বলেন নি। তিনিই বললেন, 'তোর কী দরকার রে তাতন এ সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার? তুই বাবু এসেছিস বেড়াতে। বেড়িয়ে চলে যাবি। ছোট বেলা থেকেই তুই বড় ডানপিটে। কী দরকার তেঁনাদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করার?'

ব্রজেনবাবু এবার ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাতন ডানপিটে ঠিকই।

তবে এইসব ডানপিটে ছেলেরাই এমন সব কাণ্ড কারখানা করে—যা আমাদের চিন্তায় আসে না। সত্যিই তো, রাজু কেন হঠাৎ পুকুর ঘাটে যাবে? আর গেলেও সে নিশ্চয় পুকুরে নামবে না। তাহলে সে মরল কেন?'

'কী কথার ছিরি। মরল কেন? আরে বাবা, এ হল গিয়ে নিয়তি। সেদিন ওকে ডেকেছিল।'

ঘন ঘন এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে ব্রজেন বাবু বললেন, 'না গো রমলা, তাতনের সন্দেহ আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন কিছু একটা গোপন সত্য রয়েছে যা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ব্যাস, এবার এই বুড়োটাকেও গোয়েন্দাগিরির নেশায় পেয়ে বসল। সবাই মিলে আমায় পাগল করে দেবে। একে বাড়িতে নানান রকমের উৎপাত তার ওপর—'

রমলাদেবী হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাতন বলল, 'মাসীমা একটু চা খাওয়াবে?'

'আচ্ছা' বলে উনি বেরিয়ে গেলেন। উনি চলে গেলে তাতন বলল, 'মেসো মশাই, এ বাড়িতে ঢোকার পর আমার একটা ব্যাপার বড় ধোঁকায় ফেলেছে।'

'কী'?

'আপনাদের কালো, মানে ঐ কুকুরটা—'

'জানি তুমি কী বলবে। ওটা ছিল মিশমিশে ব্ল্যাক ডগ। হঠাৎ ওর রঙ সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেল কেমন করে—এই তো?'

'হ্যাঁ, মেশোমশাই, আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'ওটাও একটা রহস্য। ভারী তাজ্জব কাণ্ড। অমন চকচকে কালো রঙের কুকুরটার কী যেন হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর দিন পনেরর মধ্যেই ওর সব লোম কে জানে কেন সব পড়ে যেতে শুরু করল। এমন একটা সময় এসেছিল, যখন কালোকে অ্যালসেসিয়ান বলে মনেই হত না। নেড়া বোঁচা একটা নেড়ি কুকুরের মতো। আমরা ভেবেছিলুম, ওটা বোধ হয় মরেই যাবে। ওমা, কোথায় কী, কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম ওর নেড়া শরীরে লোম উঠছে। আর সেগুলো সব সাদা। আর এখন তো কমপ্লীট হোয়াইট ডগ।'

শুভ্র এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল। এতক্ষণ পর মুখ খুলল, 'আচ্ছা এটাও কী ভুতুড়ে কাণ্ড?'

'বাড়ির কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হচ্ছে তাও হতে পারে।'

তাতন বলল, 'অন্য কোন কারণ?'

কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কালো কুকুর সাদা হয়ে গেল। ফ্যানটাস্টিক।

'আচ্ছা মেসোমশাই,' আবার তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'খোকনের মুখে আপনাদের এখানকার আদিত্যগড়ের গল্প শুনলুম—এ সব সত্যি?'

'হ্যাঁ বাবা, যদিও অনেক দিনের পুরনো কাহিনী, তবু ঐ দুর্গ নিয়ে অনেক আজগুবি গল্পটল্প শোনা যায়। ওখানে নাকি আদিত্যবাবুর ভূত আসে। মাঝ রাতে হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়। ভূত কতটা আসে আমরা জানি না, নিজের চোখে কোনদিনও দেখিনি, তবে এখানকার লোকের ধারনা তাই। একটা কথা কী জান, কোন বাড়ি বা প্রাসাদ বা ঐ রকম দুর্গ গোছের কিছু যদি দিনের পর দিন ফাঁকা পড়ে থাকে তাহলে আজগুবি রিউমার ছড়াতে বেশী সময় নেয় না।'

'ওখানে কেউ থাকে না?'

'আমি নিজে অবশ্য ওদিকটা যাই না। তবে কেউ কেউ বলে ওখানে নাকি এক পাগল থাকে।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ। লোকটাকে অবশ্য যত্রতত্র দেখা যায়। এখানকারই লোক। তো পাগলের তো আর ভয়ডর থাকে না। তাই হয়ত ওখানে একটা নিশ্চিন্ত বসবাসের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। তা তুমি আবার পোড়ো দুর্গ নিয়ে পড়লে কেন?'

'যেদিন আমি এখানে এসেছিলুম, সেই দিনই অনেক রাতে ঐ দুর্গটা থেকে একটা বাঁশীর আওয়াজ পেয়েছিলুম। আচ্ছা মেসোমশাই ঐ দুর্গটায় যাওয়া যায় না?'

বোধ হয় সামান্য চমকে উঠেছিলেন তিনি। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ডানপিটে ছেলেদের আমি ভালবাসি—কিন্তু...'

'থামলেন কেন মেশোমশাই?'

'তুমি আমার অতিথি আর আত্মীয়। এসেছ বেড়াতে। তোমার ভালোমন্দর বেশ কিছু দায়িত্ব আমার ওপর বর্তে গেছে।'

'আপনি বিপদ আপদের ভয় পাচ্ছেন?'

'ন্যাচার‍্যালি। আরে বাবা, ভূতের কথা ছেড়ে দিলুম, পোড়ো দুর্গের মধ্যে

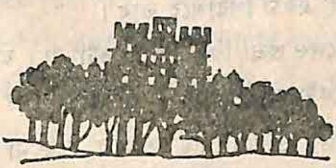
অনেক বিষাক্ত প্রাণীর বাস থাকবেই। তোমাকে একেবারে নাও বলতে পারছি না আবার প্রাণখুলে 'হ্যাঁ' বলতেও অসুবিধা হচ্ছে।'

'আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন মেসোমশাই। খুব সাবধানেই একবার ঘুরে আসতে চাই।'

'কী লাভ? তোমার রাজুকাকার রহস্যজনক মৃত্যুর সঙ্গে কী ও দুর্গের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে কর?'

'আমি কিছুই মনে করছি না তবু…'

ব্রজেনবাবু বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন, তারপর বললেন, 'তোমার মাসীমাকে জানিও না, তাহলে আমায় খেয়ে ফেলবেন। যাবার সময় অন্তত একটা লাঠি আর টর্চ সঙ্গে নিও। তবে মনে রেখো তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।'



বৃষ্টিটা আরো একদিন ভোগালো। খুব সম্ভবত হঠাৎ কোন নিম্নচাপের জন্যেই এই দুর্যোগ। বৃষ্টি থামতেই তাতনকে আর ধরে রাখা গেল না। মেসোমশাই-এর পারমিশান পাওয়া গেছে। এখন আর ওদের পায় কে? পা ভেঙ্গে খোকন গৃহবাসী। ইচ্ছে থাকলেও ওর যাবার উপায় নেই। বৃষ্টিটা যেদিন একেবারে থেমে গেল তারপরের দিনই সকালে তাতন আর শুভ্র বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে অবশ্য লাঠি টর্চ ছাড়াও তাতন কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিল একটা গুপ্তি। বলা তো যায় না—কখন কী দরকার পড়ে।

জায়গাটা এমনিতেই বেশ নিরিবিলি। এখানকার অধিকাংশ বাড়িই বেশ বড় চত্বর নিয়ে তৈরী। প্রত্যেকটা বাড়িরই নিজস্ব কিছু বাগান টাগান রয়েছে। রয়েছে সীমানা পাঁচিল। তবে বেশীর ভাগই ভাঙ্গাচোরা। সংস্কারের অভাব। জঙ্গলের প্রাধান্যও বেশী। আদিত্যগড়ের সীমানায় পৌঁছতে ওদের বেশী সময় লাগল না। খুব স্বাভাবিক কারণেই লোকজনের অভাব। প্রায় নেই বললেই হয়। বিশেষ করে আদিত্যগড়ের কাছাকাছি এসে জনমনিষ্যির দেখা

ওরা পেলো না। অবশ্যসেটা ভালোই। কারণ তাতন সেটা চায়ও না। বরং দুর্গের মধ্যে তাদের কেউ ঢুকতে দেখলে নানান জনে নানান কথা বলার সুযোগ পাবে।

পাঁচছদিন বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে। ফলে চারদিক যেন আরো বেশী করে ঝলমল করছে। এখন দুপুর। রোদটা ওদের বেশ ভালোই লাগছিল। আদিত্য-গড়ের শুরুটা ঠিক কোথায় তা বোঝা গেল না। পাঁচিলটাঁচিল যে কবে ভেঙে একাকার হয়ে গেছে তার কোন হদিশ নেই। এখন কেবল জঙ্গল। একদিকে বিশাল বিশাল গাছ যেন আকাশ ঢেকে রেখেছে অন্যদিকে বুনো আগাছায় জায়গাটাকে আরো দুর্গম করে তুলেছে। দুজনের হাতেই ছিল দুটো মোটা মোটা লাঠি। তাই দিয়েই আগাছা সরাতে সরাতে ওরা এগিয়ে চলল মূল বাড়িটার দিকে। মাঝে মধ্যে নাম-না-জানা পাখির ডাক অথবা পাতা মাড়ানো আওয়াজ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ ছিল না। নির্জন জায়গায় একটা গা ছমছমানি ব্যাপার থাকে। অকারণেই একটা শিরশিরে ভাব।

তাতন ডানপিটে হলেও শুভ্র কিছুতেই অতটা না। যত গভীর জঙ্গলে ওরা ঢুকছিল, শুভ্রর মধ্যে একটা অদ্ভুত ভয় পেয়ে বসছিল। ও ভাবছিল এই গভীর জঙ্গলে যদি একবার রাস্তা গুলিয়ে যায় তাহলে বেরুনো খুবই মুশকিল হবে। তার, ওপর তাতন যা ক্ষেপাটে ছেলে ও যে সহজে ফিরে আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত ঘুরতে ঘুরতে রাতই করে দেবে। দিনের বেলাতেই যে জঙ্গল এত নির্জন এত গা ছমছমে পরিবেশ রাতে না জানি কী অবস্থাই না হয়। কিন্তু উপায় নেই। যদিও ওর মনে হচ্ছিল ফিরে যাবার কথা। কিন্তু সে কথা তাতনকে বলার কোন অর্থ হয় না। বরং ফল হবে উল্টো। ও বলবে তুই বরং ফিরে যা। আমি না দেখে যাচ্ছি না।

গালপালা আর এবড়ো খেবড়ো আগাছা ভরা জঙ্গল পার হয়ে ওরা যখন মূল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো শুভ্রর ভয়টা ততক্ষণে সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে। নির্জনতায় যেমন একটা ভয়ের ব্যাপার আছে ঠিক তেমনি একটা নেশাও আছে। সেই নেশাটা দুজনকেই পেয়ে বসেছিল।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাতন বলল, 'নিশ্চয় কোন সাঁকো-টাঁকো আছে যা পেরিয়ে দুর্গটার কাছে যেতে হয়।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু সেটা কোথায়? ডান দিকে না বাঁ দিকে? চলতো ওদিকটা দেখি।'

ওরা আরো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কোন সাঁকোটাকো চোখে পড়ল না।

এগোতে এগোতে তাতন বলল, 'মেসোমশাই বলছিলেন—এদিকে একজন পাগল বাসা বেঁধেছে। সে নিশ্চয় ওই বাড়িতেই আস্তানা তৈরী করেছে। অর্থাৎ তাকেও এই পরিখা পার হয়েই যেতে হয়।'

শুভ্র বলল, 'ঠিক বলেছিস। কিন্তু ঐ গভীর পরিখা বেয়ে নিচে নেমে তারপর আবার ওপরে উঠে দুর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। চল আর একটু এগিয়ে যাই।'

দুই বন্ধু আরো খানিকটা উত্তর মুখো এগিয়ে চলল। ওদের অনুমান ঠিক। এপাশ ওপাশের সংযোগ স্থলটা ওরা খুঁজে পেয়ে গেল। একটা রেলিং ভাঙ্গা সাঁকো। প্রায় ন্যাড়া বোঁচা। দুতিনজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটার মত একফালি সাঁকো। সাঁকোটা এককালে ভালোই ছিল। কিন্তু এখন তার ভগ্নাংশ। খুবই সাবধানে লাঠি ঠুকেঠুকে ওরা সাঁকো পেরিয়ে পৌঁছলো দুর্গটির সামনে। অসম্ভব নির্জন একটা ভূতুড়ে বাড়ি। চারিদিকে বুনোগাছের গন্ধ। এখানে আবার পাখির ডাকটাও নেই। তাতন অনেকক্ষণ দুর্গটার দিকে তাকিয়ে রইল। আগাগোড়া লাল পোড়া ইট দিয়ে তৈরী। দুর্গের চারপাশ ঘিরে রেখেছে অনেক উঁচু একটা দেওয়াল। অবশ্য দেওয়াল অক্ষত নয়। কোথাও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। আবার কোথাও বা বিরাট ফোকর। মাত্র বিশ পঁচিশ বছরেই এই দশা। আরো বিশবছর পর যে এটার কী হাল হবে কে জানে।

একটা ফোকরের মধ্য দিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল দুর্গের মধ্যে। ওরা যে ফোকর দিয়ে আসল বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, দেখলো দুর্গের মান্ধাতা আমলের দরজাটা ঠিক তার সামনেই।

এবার একটু থামার পালা। তাতনও ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না—এখনি ঐ বাড়ির মধ্যে ঢোকা উচিত হবে কিনা। আশপাশে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই।

প্রখর সূর্যালোকের নিচে এমন অসম্ভব নির্জন জায়গা যে থাকতে পারে এটা তাতন আর শুভ্র কারোরই জানা ছিল না।

ধীরে ধীরে ওরা সিংদরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। পুরনো আমলের সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরী মজবুত দরজা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকলেও বড় দরজার গায়ে লাগানো ছোট দরজাটা হাটকরা। মাথা নিচু করে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। সামনেই বিশাল চত্বর। এককালে বেশ সাজানোই ছিল। পাথরের টব। পাথরের

পরী। পাথরের সিংহ। কিন্তু কোনটাই অক্ষত নয়। কোনটা মাথা ভেঙ্গেছে। কোনটার হাত ভেঙ্গেছে। যেগুলো বা কম ভাঙ্গা সেগুলো অজস্র ধুলোয় এবং গত কদিনের বৃষ্টিতে প্রায় কাদা কাদা। হলুদ বিবর্ণ। এখানেও আগাছার জঙ্গল। সব থেকে ভয়ের ছিল সাপ বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারের। তবে ভাগ্য ভাল এখনও কোন সাপ বা শিয়াল, কোন কিছুই ওদের নজরে পড়েনি। চত্বর পার হয়ে ওরা গিয়ে পৌঁছল মূল বাড়ির দরজায়। অবশ্য দরজা বলতে কিছু নেই। কেউ বা কারা মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে দরজা খুলে নিয়ে গেছে। দরজার সামনেই পড়ে আছে ভাঙ্গাচোরা থাম, কাঠ, পাথর। কাঠ পাথর ডিঙ্গিয়ে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেটুকু আলো ছিল সেটুকুও চলে গেল। একটা অদ্ভুত আলো আর অন্ধকারের সংমিশ্রণ। সব কিছু ভালো করে নজরে পড়ে না। চারিদিকে ভ্যাপসানো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। একটা দম আটকানো পরিবেশ। হাতের টর্চটা জ্বালালো তাতন। ঝুল, মাকড়সার জাল আর ধুলোর রাশ। কিছু কিছু অংশের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। সে সমস্ত জায়গায় বট অশথের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে।

তাতন আর শুভ্র একই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সমস্ত পরিবেশটা অনুভব করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ শুভ্র বলল, 'আর এগিয়ে কী করবি? ভূত ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

তাতন মুখে কিছু বলল না। টর্চ জ্বালিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক দেখছিল। হঠাৎ কী একটা দেখে ও খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর মাটি থেকে তুলে নিল কিছু একটা। জিনিষটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এটা এখানে আসবে কী করে?'

শুভ্রও এগিয়ে এসেছিল। তাতনের পাশে গিয়ে বলল, 'ওটা কী?'

'একটা আধপোড়া মোমবাতি। এই দেখ।'

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে শুভ্র বলল, 'ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে কী মোমবাতি আসতে পারে না?'

'পারে?'

'না পারার কী আছে? বিশ-পঁচিশ বছর আগে এখানে তো লোক বাস করত—নাকি?'

'কিন্তু মোমবাতিটা বিশ-পঁচিশ বছরের পুরনো নয়। তাহলে এতদিনে ধুলোয় চাপা পড়ে যেত।'

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস—বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে এখানে মানুষের আসা যাওয়া ঘটছে ?'

'তা জানিনা, তবে মোমবাতিটা পুরনো নয়, সলতে এখনো শক্ত আর কালো কালো হয়ে আছে।'

'ওই পাগলটাও তো আনতে পারে ?'

'আমি জানি না ঐ লোকটা ঠিক কতখানি পাগল ? তবে বদ্ধ পাগল হলে তার কাছে দিনরাত একই। আলো জ্বালার তার কী খুব দরকার হবে ?'

'তুই কী বলতে চাইছিস ?'

'আপাতত আমার কিছু বলার নেই। চল আর একটু দেখি !'

'আচ্ছা কোন পায়ের চিহ্ন টিহ্ন দেখতে পেলি ?'

'এত অন্ধকার। থাকলেও বুঝতে পারব না। আরে, ওখানে তো একটা সিঁড়ি রয়েছে। ওপরে যাবার। চ।'

শুভ্র আমতা আমতা করে বলল, 'ওপরে যাবি ?'

'কেন, তোর ভয় করছে ?'

'না মানে ঠিক ভয় নয়—বাড়ির অবস্থা, যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গা ভেঙে পড়তে পারে।'

'তোর আমার দুজনের দেহের ওজন এমন কিছু নয়। আর এ বাড়ি যিনি তৈরী করেছিলেন, খুব সম্ভবত আদিত্য নারায়ণই হবেন, তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। এত পলকা সিঁড়ি তিনি করবেন বলে মনে হয় না। চ, চ, এত দূর এসে সব না দেখে যাওয়া যায় না।'

বলেই তাতন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অগত্যা শুভ্রকেও যেতে হল পেছন পেছন। তাতন মুখে যাই বলুক সিঁড়িটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। বটের আগ্রাসী শাখাপ্রশাখা বিস্তারে বাড়ির ভেতরটা রীতিমত ভয়াবহ। সিঁড়ির ধাপ আর রেলিং ফুঁড়ে ফুঁড়ে বটের শাখাপ্রশাখাগুলো নিজেদের খুশীমত বেড়ে চলেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে উঠতে হবে। এবং সেটা দস্তুরমত কষ্টসাধ্য এবং উল্টেপাল্টে পড়ে গেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাতন অবশ্য তাতে দমে যাবার ছেলে নয়। তাতন লাঠিটায় ভর রেখে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। ওর কায়দা মত শুভ্রও কোন রকমে ওপরে উঠে এল। দোতলার অবস্থা নিচেরই মত। মাকড়সার বিশাল জাল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। ছাদের সিলিং থেকে নেমে এসেছে বটের ঝুরি। তারওপর নতুন উৎপাত ইঁদুর

ছুঁচোর ঘোরাফেরা। একটা ছুঁচো তো পায়ের ওপর দিয়েই চলে গেল। 'ওরে ব্বাপ' বলে শুভ্র একলাফে তাতনের কাছে ছুটে গেল। তাতন ওর কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'পায়ে আমাদের হেভি নর্থ স্টার। ছুঁচো ইঁদুর কাবু করতে পারবে না। কিন্তু এ একটা নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা বল ?'

শুভ্রর তখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নেশা কেটে গেছে। ও বলল, 'এই হানা আর পোড়ো বাড়িতে তুই মিছেই ঘুরে মরছিস। এই সব সাপ আর ইঁদুরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লাভ কী ? চল এবার ফেরা যাক। আর বাড়ির যা ছিরি, এখানে নেহাত দায়ে না পড়লে ভূতেরাও থাকতে আসবে না।'

তাতন সামান্য হেসে বলল, 'ভুল করছ বৎস। ভুতেরা এই রকম বাড়িতেই থাকতে ভালবাসে। ওদের তো আমাদের মত দেহ টেহ নেই। আর ওদের হেঁটে চলে বেড়াতে হয় না। ভেসে ভেসে চলে। কিন্তু আশ্চর্য কী জানিস—এখনও পর্যন্ত একটাও ভূতের দেখা পেলুম না। নিদেন পক্ষে একটা পুঁচকে ভূতও নেই। না বাড়িটা একেবারেই ভোগাস। আমাদের এত কষ্ট করার কোন মানেই হল না।'

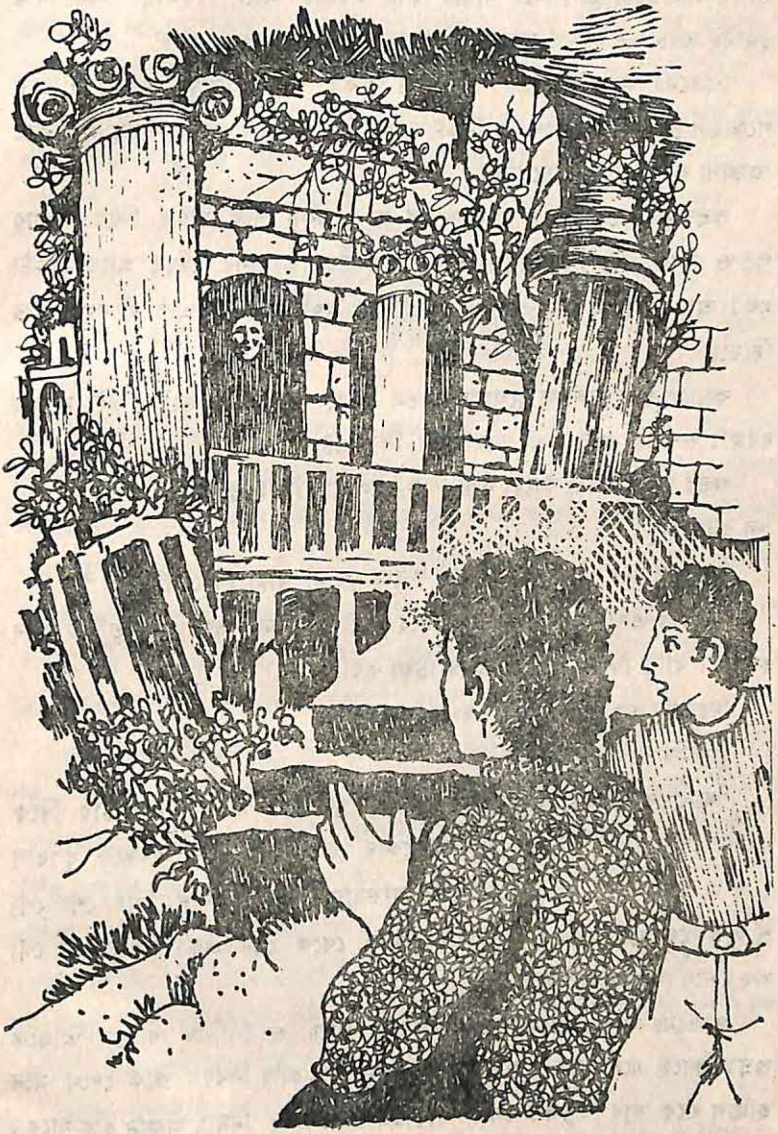
শুভ্র মনে মনে একটু বল পেয়ে বলল, 'তাহলে এবার ফিরি চল।'

'দাঁড়া আর একটু দেখে নিই। ওদিকে কয়েকটা ঘর আছে বলে মনে হচ্ছে। চল তো দেখি। টর্চটা জালিয়ে সাবধানে পা ফেলিস। কোথায় কী ভাঙা-চোরা মেঝে রয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। নে আমার হাত ধর।'

দুজনের হাতেই জলন্ত টর্চ। শুভ্রটা মেঝের ওপর আর তাতন সামনের দিকে টর্চের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে।

বাড়ির মধ্যে সত্যিই রাতের অন্ধকার নেমে এসেছিল। বাইরের কোন রোদ আর আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। আসলে জায়গাটা যে ঠিক কী এবং কেমন ভাবে তৈরী তাই ওরা বুঝতে পারছিল না। কেবলমাত্র একটা জিনিষই ওরা বুঝতে পারছিল সামনের দিকে পর পর কয়েকটা বন্ধ দরজা। তাও বোঝা যেত না যদি না ওদের কাছে কোন টর্চ থাকত। ওরা মূল বাড়ির পেছন দিকে চলে এসেছে না সামনের দিকে তাও বোঝার উপায় নেই! দুজনের মনের মধ্যে হাজার চিন্তা পাক খেলেও ওদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কে জানে হয়ত বন্ধ দরজার ওপাশে যে ঘরগুলো আছে সেখানে নিশ্চয় জানলা টানলা আছে। আর জানলা থাকা মানেই আলো-টালোর দেখা পাবে। দিনের বেলায় যে একটা বাড়ির মধ্যে এত অন্ধকার জমে থাকতে পারে এমন কোন ধারণাই ওদের ছিল না। তাতন আর শুভ্র পা টিপে টিপে বেশ ধীরে ধীরে

বন্ধ দরজাগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। তাতনের টর্চের আলো তখন সামনের দিকে।



'আঁক শব্দে বোধহয় একই সঙ্গে দুজনেই চিৎকার করে উঠেছিল। বোধ হয় দুজনেই একই সঙ্গে দেখেছিল সেই ভয়ঙ্কর কিছু। যার মধ্যে দুজনের কেউই

প্রস্তুত ছিল না। চমকটা তাতনকে এমনি বিহ্বল করে দিয়েছিল যে নিমেষের মধ্যেই ওর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গিয়েছিল। আর সম্বিত ফিরে পাবার পর তাতন যখন টর্চটা তুলে নিয়ে আবার সেই দরজায় আলো ফেলল, তখন কিন্তু দুজনেই ভয়চকিত দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটা কী ?'

তাতনের মত ডানপিটে ছেলেরও বুকের স্পন্দন বেড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছিল দুজনেই। তারপর খানিকটা সাহস ফিরিয়ে এনে তাতন ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুইও দেখেছিস ?'

শুভ্রর মুখ দিয়ে তখনও রা কাড়ছিল না। একটু পরে সম্বিত ফিরে আসার পর ও বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি। স্পষ্ট। বন্ধ দরজার ওপর ভেসে আছে একটা মুখ। আর তার কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে মুখটাই লাল আর বীভৎস করে দিয়েছে।'

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে তাতন বলল, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। ওই মাঝের দরজার ওপরেই মুখটা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওটা কার মুখ ?'

শুভ্রর তখন কাঁদো কাঁদো গলা। ও বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। চল্ বাড়ি চল্।'

'তা তো যাব, কিন্তু ওটা সত্যিই কারো মুখ না আমাদের দেখার ভুল ?'

'দুজনের একই সঙ্গে দেখার ভুল হবে ? প্লীজ তাতন, আর গোয়াতুর্মির মানে হয় না। বাড়ি ফিরে নয় ধীরে সুস্থে চিন্তা করা যাবে।'

'দরজাটা একটু ঠেলা দিয়ে দেখলে হত না ?'

'সে নয় পরে একদিন—'

'আচ্ছা তুই দাঁড়া, আসছি' বলেই তাতন খুব দ্রুত গতিতে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, কোথা থেকে কী হল, একসঙ্গে ধুপধাপ দুরদার শব্দে কিছু একটা হুটোপুটির আওয়াজ। কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে কী যেন উড়ে চলে গেল। আর কোথা থেকে যেন একটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

তাতনের আর এগুনো হল না। ধীর পায়ে ও পিছিয়ে আসতে আসতে শুভ্রর কাছে এসে পড়ল। শুভ্র তখন নির্বাক, এবং প্রায় নিথর। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওকে আর কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়াতে বললে ও নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর এই অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গেলে তাতনের একার পক্ষে সম্ভব নয় ওকে কাঁধে করে ঐ দুরুহ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যাওয়া। ওর মনে সাহস ফিরিয়ে

আনার জন্যে তাতন বলল, 'নাঃ শুভ্র, তুই সত্যিই ভয় পেয়ে গেছিস। আচ্ছা ঠিক আছে চল, পরে আমাকে একাই আসতে হবে।'

ওরা যখন সিঁড়ি টিড়ি ভেঙ্গে ঠিক মত রাস্তা চিনে দুর্গের বাইরে এসে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যে। সূর্য ডুবে গেছে। শেষ আলোটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এতক্ষণে শুভ্রর মনে হল এখন শীতকাল চলছে। তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে ও কপালের আর মুখের ঘাম মুছে নিল। তারপর বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা অন্ধকার হবার আগেই সামনের জঙ্গলটা পার হতে হবে।'



হৈচৈটা আরম্ভ করলেন খোকনের মেজকাকা জীতেনবাবু। তাতনদের গুপ্ত অভিযানের খবরটা ওঁর জানার কথা নয়। জানতেন বাবা আর খোকন। নিশ্চয় এরা কেউ মুখ খুলবেন না। কিন্তু বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা শুনল জীতেন বাবুর চিৎকার চেঁচামেচি। আওয়াজটা আসছিল বৈঠকখানা ঘর থেকে। গলাটা জীতেনবাবুরই, 'না দাদা, এসব কিন্তু ভালো কথা নয়। আর তুমিই বা ওদের পারমিশান দিলে কী করে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। বৌদি তুমিই বল, একটা কিছু ভালো-মন্দ ঘটলে সেন বাড়ির বদনামের শেষ থাকবে না।'

বৌদি মানে খোকনের মায়ের গলা পাওয়া গেল, 'পাগল করে দেবে, সবাই মিলে আমায় পাগল করে দেবে। দিদির এই ছেলেটার মাথায় যে কী সব গোয়েন্দা গিরির ভূত চেপেছে। কে না কে নীল ব্যানার্জীর চেলা হয়েছে। কিন্তু বাবু এখানে কেন? ভালো-মন্দ ঘটলে সারাজীবনেও দিদির কাছে মুখ দেখাতে পারব না। ওগো কিছু একটা কর। সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনও তাদের দেখা নেই।'

'আঃ রমলা, এত অল্পেই অধৈর্য্য হয়ে পড়ছ কেন? দুজনেই বেশ চালাক চতুর ছেলে। দেখ এখুনী এসে পড়বে।'

'কিন্তু তুমি ওদের যেতে দিলেই বা কেন?'

'তাছাড়া' আবার জীতেনবাবুর গলা, অশরীরী আত্মা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার চেষ্টা, এগুলো তো ঠিক নয়। ওদের আর কী, ওরা এসেছে, চলে যাবে, কিন্তু এই

কটা মাস ধরে এ বাড়িতে কী সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে বলদিকি ? অত করে তোমায় বললুম, হয় রাজুর জন্যে একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ণ কর, নইলে চল এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই।'

'জীতু, ছেলেমানুষী করিস না। পুজো আচ্চা করতে বলিস করছি—কিন্তু পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবিস কেন ?'

'তাই বলে ভূত প্রেতের হাত প্রাণ দিতে হবে ?'

'তুই একটা লেখাপড়া জানা লোক, এখনও এসব বিশ্বাস করিস ?'

'তুমি করনা, নিজেই তো একদিন দেখলে, চাদর সরাতে গিয়ে বিছানায় কঙ্কাল। বল সেটা কী ? চোখের ভুল ?'

ব্রজেনবাবুর বোধ হয় কোন উত্তর দেবার কিছু ছিল না। উনি চুপ করে রইলেন। তাতন আর শুভ্র দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। কখন যেন তারক এসে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের পাশে। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ এনে ও বলল, 'দাদাবাবু আর দাঁড়িয়ে কেন ? যাও একবার দেখা দিয়ে এস। বড়বাবু বড্ড চিন্তা করছিলেন।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি' বলে তাতন সবে এগুতে যাবে এমন সময় তারক পিছন থেকে কোটের পকেট টেনে ধরে বলল, 'দাদাবাবু, তোমারে একটা কথা বলব। বড় গোপনীয়। কাউকে বলতে পারবেন না কিন্তু।'

'এখুনী বলবে ?'

'আগে ঘুরে এস। তারপর বলব।'

তাতন আর শুভ্র ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাতন বেশ লক্ষ্য করল ওদের ঢুকতে দেখে ব্রজেনবাবুর মুখে যেন প্রাণ ফিরে এল, উনি বললেন, 'এসেছিস ?'

'হ্যাঁ মেসোমশাই।'

বৈঠকখানা ঘরে তখন যেন হাট বসেছে। ব্রজেনবাবু, জীতেনবাবু, রমলাদেবী, জীতেনবাবুর স্ত্রী ওঁর দুই ছেলে মেয়ে। খোকনের বোন নেলী। তাতন একবার সবাইকে চোখ বুলিয়ে নিল। হঠাৎ একটি নতুন মুখ দেখে ও একটু আশ্চর্যই হল। বছর ত্রিশ বত্রিশের এক যুবক। বেশ ছিমছাম। উল্টোনো চুল, চোখে চশমা। গায়ে একটা কালো আলোয়ান জড়ানো। উনি বসেছিলেন জীতেন বাবুর স্ত্রীর পাশে। তাতন একটু আশ্চর্য হল। এর আগে ওই ভদ্রলোককে ও কোনদিনই দেখেনি। এমন কী খোকনও এর কথা বলেনি। তাতনদের দেখে জীতেনবাবুই হাঁই হাঁই করে উঠলেন, 'তুমি আজ ঐ পোড়ো দুর্গে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ মেজোকাকা।'

'বাট হোয়াই ? কে তোমায় বলেছিল ? দরকারটাই বা কী ?'

আসল উদ্দেশ্য চেপে তাতন বলল, 'না কোন দরকার নয়। নিছক কৌতূহল। একটা হিস্টোরিক্যাল জায়গা তো বটেই।'

'সারা দেওঘরে অনেক হিস্টোরিক্যাল প্লেস আছে।'

'পোড়ো দুর্গ কিন্তু মেজোকাকা, অনেক ইন্টারেস্টিং।'

'চুপ করো। তুমি জানো, ওখানে কত ভয়াবহ জন্তু-জানোয়ার আছে। সাপ খোপ আছে। বিষাক্ত সব সাপ। একবার ছোবল মারলে দেখতে হবে না। নো নো ইট্‌স্ ভেরী ব্যাড। ভেরী ব্যাড।'

হঠাৎ জীতেনবাবুর স্ত্রীর পাশে বসা সেই ভদ্রলোক বললেন, 'জামাইবাবু দিদির মুখে শুনলুম, ছেলেটা নাকি খুদে গোয়েন্দা!'

এতক্ষণে ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া গেল। উনি জীতেনবাবুর শ্যালক। শ্যালকের কথা শুনে জামাইবাবুটি বললেন, 'হতে পারে। কিন্তু এখানে গোয়েন্দা-গিরির তো কোন ব্যাপার নেই। এখানে কোন খুন খারাবি হয়নি। কোন চুরি রাহাজানি হয়নি। সব থেকে বড় কথা ও-একফোটা ছেলে। ও এসেছে বেড়াতে, কী দরকার এসব নিয়ে মাথাঘামাবার।'

শ্যালকবাবু বোধহয় তাতনকে নিয়ে ঠাট্টা করতে চাইছিলেন। উনি বেশ কৌতুক করেই বললেন, 'খোকা, তোমার নামটা যেন কী? এর আগে কোন রহস্যময় কেস হ্যাণ্ডেল করেছ নাকি ?'

'করলে আপনার কোন আপত্তি আছে নাকি ?' তাতন বেশ বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল।

'না না, আপত্তির কী। ক্ষুদে গোয়েন্দার ব্যাপার স্যাপার গল্পের বইতে পড়েছি। চোখে তো আর দেখা হল না। তা এখানে কোন রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে বলে তোমার মনে হচ্ছে ?'

এবার সোজা উত্তর না দিয়ে তাতন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার কী মনে হয় এখানে কোন রহস্যময় ঘটনা আদৌ ঘটেনি ?'

'আমরা তো আর গোয়েন্দা নই, কী করে বুঝব বল ? তা রহস্যটা কী ? খুন না ভূত ?'

'ভূত বলে কিছু আছে নাকি ? দেখেছেন কোনদিনও চোখে ?

'বলে কীরে ? ও জামাইবাবু ...এ খুদে গোয়েন্দা তো ডেঞ্জারাস কথা বলছে—

'ডেঁপো, ডেপো, আজকালকার ছেলেদের পুরনো সবকিছুকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়েছে। যার রেজাল্ট পরবর্তী জেনারেশনের অবক্ষয়।'

তাতন কিছু উত্তর দেবার আগেই শুভ্র বলল, 'মেসোমশাই, আমরা খুব টায়ার্ড। ওপরে যাব?'

মেসোমশাই মানে ব্রজেনবাবুও বেশ অস্বস্তি ফীল করছিলেন। জীতেনবাবুকেও কিছু বলতে পারছিলেন না।

আবার তাতনের স্বপক্ষেও কিছু বলতে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শুভ্রর কথায় ওনার সম্বিত ফিরে এল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমরা ওপরে গিয়ে বিশ্রাম কর। খোকন একলা আছে। বোর ফিল করছে। রমলা তারক বা কল্পনাকে বল ওদের খাবার টাবার ওপরে পাঠিয়ে দিতে।'

তাতন আর শুভ্র আর কোন কথা না বলে ওপরে চলে গেল। কিন্তু বৈঠক-খানার সোরগোল তখনই মিটল না। বিশেষ করে কথাবার্তার জের টেনে চললেন, সজলবাবু মানে জীতেনবাবুর শ্যালক। কথায় বলে মার থেকে মাসীর দরদ বেশী। সজলবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হল। জীতেনবাবুর উদ্দেশ্যেই উনি বললেন, 'জানেন দাদা, এই সব আজকাল ছেলেদের পাকামী দেখলে গা পিত্তি জ্বলে যায়। তোর কী দরকার রে বাপু। এ বাড়ির পারসোন্যাল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর? বড় বড় তান্ত্রিক আর ওঝারা যেখানে হার মেনে যাচ্ছে, সেখানে দুদিনের পুঁচকে ছোকরা। তারওপর গেছে কিনা পোড়ো ভূতুড়ে দুর্গটায়। এখানকার লোকেরাই যেতে ভয় পায়। না দাদা, এ ঠিক নয়, কোথায় গিয়ে মরে টরে পড়ে থাকবে, তখন আপনাদের হাতে হাতকড়া।'

রমলাদেবী বোধ হয় জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছিলেন। শেষের কথায় উনি থমকে দাঁড়ালেন, 'এসব কী অলক্ষুণে কথা বলছ সজল। ছোট ছেলে, ওদের কৌতূহল একটু বেশী। তাই বলে মরা টরার কথা কেন?'

উনি আর দাঁড়ালেন না। ব্রজেনবাবুও আর চাইছিলেন না জল ঘোলা করতে। উনি একটা বই টেনে তক্তার ওপর গা এলিয়ে দিলেন। ছন্দাদেবী মানে জীতেন বাবুর স্ত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আসলে এই সান্ধ্য বৈঠকটা হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি থেমে যাবে সেটা ঠিক ছন্দাদেবীর মনঃপুত হল না। সন্ধ্যেবেলা সাধারণত এ বাড়িতে তেমন কাজকর্ম থাকে না। প্রতিদিনই ওরা বৈঠকখানায়

বসেন। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পটল্প করে তারপর সবাই খেতে যান। এটা এ বাড়ির রেওয়াজ। ঝিমনো আলোচনার জের টানলেন ছন্দাদেবী, বললেন, 'কিন্তু দাদা, তাতন যেন কী সব রহস্য টহস্যের কথা বলল। তারপর বলল, ভূতটুত ছাড়াও নাকি অন্য কিছু ব্যাপার আছে?'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন জীতেনবাবু, 'অন্য ব্যাপার মানে? আবার কী ব্যাপার থাকতে পারে?'

ছন্দাদেবী বললেন, 'তোমরা এমন সব আরম্ভ করলে ছেলেটার কাছ থেকে কিছু জানাও হল না। তাতন বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। নিশ্চয় ও অন্য কিছু ভাবছে।'

'এর মধ্যে আবার অন্য কী থাকতে পারে,' সজলবাবু টিপে টিপে বললেন, 'এ'তো প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল ব্যাপার। ছোড়দা মারা গেছে। অপঘাত মৃত্যু। তার আত্মা এখনও এ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। বারবার তাই ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। গত তিন চার মাসের ঘটনা থেকে তাই মনে হয়। তোমরা সব তিলকে তাল করতে চাও।'

'একজ্যাক্টলি সো। আর বলাইদাতো ফোরকাষ্ট করেই দিয়েছিলেন, রাজুর ফাঁড়া, বাড়ির মধ্যে নানান ভূতুড়ে উপদ্রব, সব মিলে যাচ্ছে। বড়দা, তুমি এখনও গায়ে মাখছ না, দেখো, বলাইদার থার্ড প্রেডিকশানও মিলে যাবে।'

বই থেকে মুখ না তুলেই ব্রজেনবাবু বললেন, 'থার্ড প্রেডিকশানটা কী?'

'আমাদের শেষ পর্যন্ত এ বাড়ি ছাড়তে হবে।'

'তোর কী সেরকম ইচ্ছে আছে?'

'ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করতে হয় দাদা। তারপর কিছু একটা অঘটন ঘটলে—।'

'কী অঘটন ঘটতে পারে?'

জীতেনবাবুর উত্তর দেবার আগেই সজলবাবু বললেন, 'অঘটনের কথা কী আগে থেকে বলা যায়? কতকী হবার আছে। প্রেতাত্মাদের কোন বিশ্বাস নেই।'

খানিকটা বিরক্ত হয়েই ব্রজেনবাবু বললেন, 'বেশতো, তোমাদের যদি মনে হয় এবাড়ি আর তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, তাহলে আমি নিশ্চয় বাদ সাধব না। ইচ্ছে হলে তোমরা অন্যত্র যেতে পার।'

'এ কিন্তু দাদা তোমার গোয়াতু´মি।'

'গোয়াতুমির কী দেখলি ? তোরা যে সব ব্যাপার নিয়ে ভয় পাচ্ছিস বা ভয় পেতে চাইছিস, আমার সে সবে কোন ভয় বা বিশ্বাস নেই। তাছাড়া বাপ ঠাকুর্দার বাড়ি ছেড়ে এই বয়েসে আর কোথাও যাবার আমার ইচ্ছে নেই। অবশ্য তোরা যেতে চাইলে তোদের আটকে রাখার ক্ষমতাও আমার নেই।'

হঠাৎ সজলবাবু বললেন, 'কিন্তু জামাইবাবুতো ওঁর ভাগের অংশ বিক্রি করে দিতে চাইছেন।'

এবার উঠে বসতে বাধ্য হলেন ব্রজেনবাবু। হাতের বইটা মুড়ে রেখে বললেন, 'ভাগের অংশ বিক্রি মানে ?'

'বিক্রি মানে…'

হাত তুলে সজলবাবুকে থামালেন ব্রজেনবাবু। বললেন, 'না সজল, এখন এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে এসে দাঁড়াচ্ছে। তুমি বাইরের লোক, তুমি এর মধ্যে কথা বোলোনা। জীতু, তুই-বল সব কিছু খোলাখুলি। নেলী, তুই একটু বাইরে যাতো মা। এসব কথায় তোর থাকার দরকার নেই। জীতু তোর ছেলে মেয়েদেরও বাইরে যেতে বল।'

অগত্য সেনবাড়ির তিন ছেলে মেয়ে বাইরে চলে গেল।

'এবার বল।'

'দাদা সত্যি বলতে কী আমি এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছিনা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। রাজু আমাদের পুকুরে ডুবে মরেছিল। ও পুকুর ঘাটে আমি ভুলেও পা বাড়াইনা। রাত্রে এই বৈঠকখানা আর নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যেতে সাহস হয় না। কেবলি মনে হয় এই বুঝি আড়াল থেকে রাজু বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াবে। এত ভয় নিয়ে কী শান্তিতে বাস করা যায় ?'

'ভয়টা তো মনের ব্যাপার। ওটাকে আমল দিচ্ছিস কেন ?'

'আমি তোমার মত সাহসী নই দাদা। আমি অফিসে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি। কলকাতায় ট্রান্সফারের অর্ডারও পেয়ে যাব খুব শিগগীরই। কিন্তু বাসা ভাড়া করে নতুন এসট্যাবলিশমেণ্ট বাড়াতে পারব না। তাই, আমার পোরসানটা বিক্রিই করে দোব ভাবছি। এখন তো এবাড়ির মালিকানা তোমার আর আমার।'

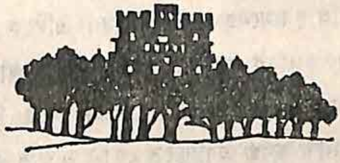
'পিতৃপুরুষের বাড়ি তুই বিক্রি করে দেবার কথা ভাবতে পারছিস ?'

'যেখানে বসবাসই করতে পারব না সেখানে মিথ্যে সেন্টিমেণ্টের দোহাই পেড়ে আটকে থাকার কোন মানেই হয় না।'

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন ব্রজেনবাবু। বাড়ি বিক্রির কথা তাঁর আদৌ মনঃপুত হয়নি। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন সর্বনাশের শুরু হয়ে গেছে। তাঁর নিজের এত টাকা নেই যে জীতুর ভাগের অংশ তিনি কিনে নিতে পারেন। আর বিক্রি হওয়ার অর্থ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে বাপ পিতামহর সমাধি।

আরো কিছু সময় বসে থাকার পর ব্রজেনবাবু বললেন, 'জীতু, তোমার বয়েস হয়েছে। এবং তোমাকে নির্বোধ ভাবার কোন কারণ নেই। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত আরো একটু ভেবে দেখো।'

এক কড়া দুধ ছানা কাটা হয়ে গেছে। এরপর আর তেমন কোন কথা হলনা। ব্রজেনবাবু মোড়ানো বইটা নিয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে চলে গেলেন। আর বাকী তিনজন বসে রইলেন, বোবা হয়ে।



সেই রাত্রেই সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে তাতন ডটপেন আর কাগজ নিয়ে বসল। ও চিঠি লিখছিল ওর গুরু গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জিকে। সকাল থেকে অনেক কিছু বিসদৃশ ঘটনা ওকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। এখানে আসার পর থেকে যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করে শেষে ও লিখল, নীলকাকু কয়েকটা ব্যাপার আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। পোড়ো দুর্গের মধ্যে সেই রহস্যময় রক্তমাখা মুখটা কী ? একবার দেখা দিয়ে সেটা হঠাৎই অন্ধকারে মিলিয়েই বা গেল কী করে ? ওরকম একটা ভয়াবহ রকমের হানাবাড়িতে মোমবাতির টুকরো আসে কোত্থেকে ? মোমবাতিটা আমি তারপরেও অনেকবার দেখেছি। বেশীদিনের পুরনো নয়। তার অর্থ কেউ নিশ্চয় ওখানে আলো জালিয়েছিল। নিশ্চয় ভূতে নয়! তাহলে কী যে পাগলের কথা মেশোমশাই বলেছিলেন সে ? কিন্তু ঐ ধরণের একটা বাড়িতে যে পাগল আস্তানা গাড়তে পারে, সে নিশ্চয় বদ্ধপাগল। আর একজন বদ্ধপাগলের কী মোমবাতি জ্বালার দরকার হবে ? যদি হয় তাহলে সে মোমবাতি পেলো কোত্থেকে ? চেনা জানা একজন বদ্ধপাগলকে কোন দোকানীই মোমবাতি দেবে না। তারকদা আমায় কিছু বলতে চায়। কী এমন গোপনীয় কথা যা নাকি অন্য কারো সামনে সে বলতে রাজী নয়। তার অর্থ তারকদা এবাড়ির কিছু কিছু

লোককে অবিশ্বাস করে। তারা কারা? আমি একটু পুরানো ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করছি বলে এখানে অনেকেই খুব আপত্তি জানাচ্ছে। সত্যই কী আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে ওরা আমাকে দুর্গে যেতে বারণই করছে? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? অর্থাৎ তারা চাইছে না এসব পুরনো ব্যাপার নিয়ে কেউ কোন ফ্যাকরা তুলুক। যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয় এসব ভূতুরে কাণ্ডকারখানার পেছনে অন্য কোন সত্য রয়েছে যা নাকি ভূতের গল্পে চাপা দেওয়া হচ্ছে! পোড়ো দুর্গ থেকে বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসে রাত দুপুরে। আমি নিজে শুনেছি। ভুল হবার না। ভূত প্রেত আমি বিশ্বাস করিনা। কোন অশরীরী ব্যাপার আমার চিন্তায় আসে না। আমার মনে হয় এর পেছনেও কোন রহস্য আছে। এবার আমায় একা একদিন ঐ পোড়া দুর্গে যেতে হবে। শুভ্র খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওকে নিয়ে যাওয়া মানে পণ্ডশ্রম। আঃ নীলকাকু, এই সময়ে তুমি যদি কাছে থাকতে আমি খুব মনের জোর পেতুম। এদিকে মেশোমশাই-এর ভাই জীতেনবাবু তাঁর শালা দুজনেই ভূতের ভয়ে কাবু। জীতেনবাবু তো আজ সন্ধ্যেবেলা জানিয়ে দিয়েছেন নিজের ভাগ বিক্রি করে তিনি কলকাতা চলে যাবেন। এখানে এসে আমি অবশ্য এবাড়িতে কোন ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখিনি তাছাড়া...

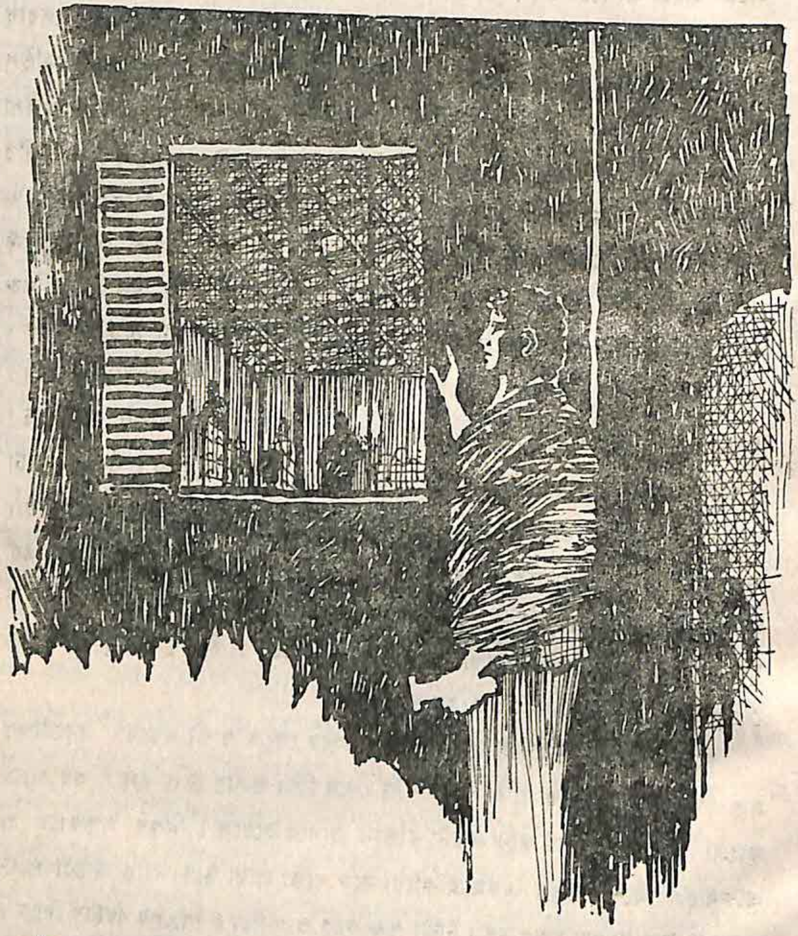
হঠাৎ লেখা থামাতে হল তাতনকে। ও একমনে লিখে যাচ্ছিল ঘড়িতে কটা বাজে সে হুঁশ ওর ছিল না। কিন্তু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বরাবরই সজাগ। সেই ইন্দ্রিয়টা ওকে যেন হঠাৎ নড়িয়ে দিল। বারান্দায় যেন কার পদশব্দ। লেখা থামিয়ে ও মনোযোগী হল বাইরের শব্দে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ও শব্দটাকে অনুধাবন করতে চাইল। কেউ যেন হেঁটে চলেছে। তার জামাকাপড়ের খসখস শব্দ পরিষ্কার। প্যাড আর পেন নামিয়ে ও খুব সন্তর্পণে খাট থেকে নামল। ঘরের আলো নেভানোই ছিল। কারণ ঘরে আরো দুজন তখন ঘুমন্ত। 'খুট' শব্দে টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নিবিয়ে ও ধীরে ধীরে বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল। শব্দ আস্তে আস্তে যেন দক্ষিণের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে। কোন ভুল নেই কেউ একজন হেঁটে চলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ত্বরিতগতিতে বালিশের পাশ থেকে নিজের টর্চটা নিয়ে আবার দরজার কাছে ফিরে এল। খুব সন্তর্পণে খুলে ফেলল ঘরের খিলটা। আবার আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করল। নাঃ কিছুই চোখে পড়েনা। দরজার ওপাশে নিটোল অন্ধকার। এখন কিন্তু আর কোন শব্দ ছিল না। দরজাটা আরো খানিকটা ফাঁক করে ও বেশ কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। একরাশ অন্ধকার ছাড়া আর কোন কিছুই ওর নজরে এল না। প্রশস্ত বারান্দাটা যেন অন্ধকারে আর ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়েছে। হাড় কনকনানি ঠাণ্ডায় আর এই গভীর রাতে কারো জেগে থাকার কথাও নয়। ওর নিজের কালো রঙের ব্যাপারটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দক্ষিণের বারান্দার দিকে। খানিকটা এগিয়ে গিয়েও কিন্তু কোন কিছুই ওর নজরে পড়ল না। তবে কী সবটাই ভুল? সবটাই অপরাধ সম্বন্ধে বেশী চিন্তার করার ফল? কিন্তু একটা কারো পদশব্দ ও শুনেছিল এটায় কোন ভুল নেই। তবে কী তারকদা? তারকদা আজ সন্ধ্যেবেলা ওকে কিছু বলবে বলেছিল। গোপন কিছু। হয়ত সেই এসেছিল রাত গভীর হ'তে। দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছে। আরো মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে ও যেইমাত্র নিজের ঘরের দিকে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণের বারন্দার ওপরে তিনতলায় ওর নজর আটকে গেল। এক ফালি সরু আলো তিনতলার শেষ ঘরে ঘোরাফেরা করছে। নিঃসন্দেহে ওটা টর্চের আলো। কিন্তু সব থেকে বড় কথা ও ঘরটা তো রাজুকাকার ঘর। ওর ল্যাবরেটরি রুম। এখান এসে ও শুনেছে ঘরটা রাজুকাকা মারা যাবার পর থেকেই তালাবন্ধ। ভূতটুত দেখা দেবার পর ভুলেও কেউ তিনতলার ঘরে যায় না। পরপর দুটো ঘরই রাজুকাকার। একটায় উনি শোয়াবসা করতেন, অন্য ঘরটা ওঁর ল্যাবরেটরি। আশ্চর্য, দিনের বেলাতেই তিনতলায় সাধারণত কেউ ওঠে না আর এখন এই গভীর রাতে কেউ একজন ঐ ঘরে ঢুকেছে। যেভাবে টর্চের আলো এদিক ওদিক ঘুরছে, মনে হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী কিছু যেন খুঁজছে। কী খুঁজছে? এক মৃত বৈজ্ঞানিকের ঘরে কী খোঁজবার আছে?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাতন মনস্থির করে ফেলে ও কী করবে। বেড়ালের মত ক্ষিপ্র আর নিঃশব্দ গতিতে ও সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় চলে এল। ওর গায়ে কালো র‍্যাপার থাকার জন্যে একটা বাড়তি সুবিধে হয়েছে। নিকষ অন্ধকারে ও একেবারে মিশে গেছে। একমাত্র কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগা ছাড়া আর কারো পক্ষে ওকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। টর্চটা শক্ত করে ও এগিয়ে চলল শেষ ঘরটার দিকে।

শেষ ঘরের দরজার সামনে এসে ও দাঁড়াল এক মুহূর্ত। টুক করে মাত্র এক লহমার জন্যে দরজার গায়ে লাগানো কড়ার ওপর ফেলল টর্চের আলো। যা ভেবেছে ঠিক তাই। ভূত নয়, কোন মানুষই ঢুকেছে ঐ ঘরে। কারণ দরজার গায়ে লাগানো তালা খোলা অবস্থায় ঝুলছে। কিন্তু লোকটা একটা মারাত্মক ভুল

করেছে। তালা খুলেছে কিন্তু চাবিটা তালার গায়ে লাগানো অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করে গেল। আচ্ছা, এখন যদি তালাটা লাগিয়ে দেওয়া যায়? তাহলে তো হাতে নাতে কট্। একবার ভাবল তাই করবে। কিন্তু তাতে লাভ? কী প্রমাণ হবে তাই দিয়ে? যে ঢুকেছে সে নিশ্চয় এ বাড়িরই



কেউ। তার অধিকার আছে তাদের এক নিকট আত্মীয়ের ঘরে ঢোকার। একমাত্র তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করতে পারে রাত্রে লুকিয়ে কেন সে ওই ঘরে আসবে? কিন্তু তা দিয়ে তো কিছু প্রমাণ হবে না। তার কোন দুরভিসন্ধির কথাও জানা যাবে না।

ওচিন্তা ত্যাগ করে তাতন আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল আরো পিছনের জানলার দিকে। জানলা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু কাচের জানলা। বন্ধ থেকেও কোন অসুবিধার কিছু নেই। তাতন জানলার পাশে গিয়ে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। অস্পষ্ঠ এক ছায়ামূর্তি দেওয়ালের ওপর টর্চ ফেলে ফেলে কী যেন দেখছে। সাদা দেওয়ালে অজস্র হিজিবিজি দাগ। কোথাও বা অঙ্ক কষা। লোকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি আঁক, প্রতিটি লেখা যেন পড়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ছায়ামূর্তি একটা লেখার ওপর বেশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়েও রইল। তারপর পকেট থেকে খাতা পেন্সিল বার করে দেওয়াল লিখন টুকতে শুরু করল। কাজটা করতে তার বেশ সময় লাগছিল। কারণ টর্চের আলো জেলে জেলে সে লেখাগুলো পড়ছিল, তারপর আবার টর্চের আলো জেলে খাতায় তা টুকে নিচ্ছিল।

কিন্তু কিছুতেই লোকটার মুখ বোঝা যাচ্ছিল না। কারণ তার মুখ ছিল দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল তা মনে নেই। তাতনও বুঝতে পারছিল না এইভাবে কতক্ষণ ওকে দাঁড়াতে হবে? অন্তত লোকটা কে সেটুকু না জানা পর্যন্ত তাকে থাকতেই হবে। এমন সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না।

এদিকে মশায় ওকে অস্থির করে তুলছিল। দেওঘরে মশার বড় উৎপাত। এখানে মশারি ছাড়া শোয়াই যায় না। এখন এই ফাঁকা জায়গায় বাগে পেয়ে মশারা তাকে একসঙ্গে ছেঁকে ধরেছে। নড়ারও উপায় নেই। মারারও উপায় নেই। কোন শব্দ করার জো নেই। নিঃশব্দে মশার কামড় হজম করে ও দাঁড়িয়ে রইল অনন্ত প্রতীক্ষায়।

সুযোগ এল। কিন্তু সে যা দেখল তা দেখার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কিছু একটা 'খুট' শব্দ হতেই ছায়ামূর্তি জ্বালানো টর্চ হাতেই ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু মাত্র এক লহমা। তারপরই সে নিবিয়ে দিল হাতের টর্চ। ত্বরিতগতিতে দরজার কাছে চলে গেল। তারপর আওয়াজ হলো দরজা বন্ধ করার। কড়ায় তালা লাগাবার।

কিন্তু সেই এক লহমায় দেখা মুখটা তাতনকে আবার ধন্দে ফেলে দিল। সামান্য আলোতেই তাতন দেখেছিল কোন মানুষের মুখ না। একটা কঙ্কালের মুখ।

ঐ পরিবেশে, ঐ অবস্থায় অন্য কেউ হলে ভয় পেতো, অথবা চেঁচিয়ে উঠত।

কিন্তু তাতনের যুক্তিবাদী মনে তখন অন্য চিন্তা। যে এসেছিল সে অত্যন্ত সেয়ানা। সে ভূত নয়, সে অশরীরী কেউ নয়। সে রক্ত মাংসেরই কোন মানুষ। আর তার অভিসন্ধি খারাপ। কারণ সে ভূতের ছদ্মবেশে এসেছে। ধরা পড়লেও ও ভয়টয় দেখিয়ে পালাবে।

'ধন্যি তোমার সাহস বাপু।'

কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল কথাগুলো। এতক্ষণ তাতনের মনে কোন ভয়ডরের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু আচমকা কানের কাছে শব্দগুলো হতেই ও চমকে উঠল। 'কে' বলেই পেছন ফিরতেই লোকটা আবার বলে উঠল, 'আস্তে, একদম কথা বলবেনি। এখানে বাতাসের কান আছে।'

'তারকদা তুমি?'

'আমি তোমার আগেই এসেছি।'

'কিন্তু—'

'আমি জানি ও কে?'

'মানে এতক্ষণ যে ভেতরে ছিল?'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা তোমারে বললুম নি, কিছু কথা বলব। ওর কথাই তো বলতুম।'

তাতনের আর তর সইছিল না। ও জিজ্ঞাসা করল,' 'তাহলে বল, এখনি বল। কে ও? কী খুঁজছিল ও এতরাত্রে? সবাইকে লুকিয়ে!'

'না দাদাবাবু 'সব কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। সে জায়গাও এটা নয়। বলতে সময়ও লাগবে অনেক। তুমি এক কাজ করো। কাল সন্ঝেবেলা, বাবা বদ্রীনাথের মন্দিরে চলে এসো। পুবদিকের দরজায়। আমি থাকবনি। একাই যেও কিন্তু। তুমি সাহসী ছেলে। দেখো যদি কিছু করতি পার।'

'কিন্তু লোকটা কে অন্তত বলে যাও।'

'থাক, কালই হবে সব কথা। ও লোকটাকে আমি বিশ্বেস করিনা। ওর কান সবখেনে। আমাদের কথা সব শুনেছে কিনা কে জানে। রাত পেরায় দুটো। যাও এখন শোও গিয়ে।'

ঘরে ফিরে কিন্তু তখনি শোয়া হল না। একটু আগে ঘটে যাওয়া সব কিছু নীল ব্যানার্জীকে জানিয়ে খামে এঁটে ও শুয়ে পড়ল। খোকনদের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে তিনটে বাজছে।



শুভ্র আর খোকনের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাতনের। ধড় মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞাসু নেত্রে ওদের দিকে তাকালো। দুটো মুখ তখন ভয়ে বিবর্ণ। 'কী হয়েছে' প্রশ্ন করার আগেই খোকন বলে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছেরে তাতন! এত দূর যে গড়াবে তা ভাবতে পারিনি।'

'কী হয়েছে বলবি তো।'

খোকনের বলার আগেই শুভ্র বলে উঠল, তারকদা মনে হচ্ছে খুনই হয়েছে। উঃ, কী বীভৎস দৃশ্য।'

'অ্যাঁ, বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তাতন, তারপর বলল, 'কী বলছিস তোরা?'

'হ্যাঁরে, নিচে গেলেই সব বুঝতে পারবি। আমরা এই মাত্র দেখে আসছি।'

কোনরকমে গায়ে র‍্যাপারটা জড়িয়ে পড়িমড়ি করে ও নিচে নেমে এল। তারকদার ঘরটা ছিল রান্নাঘরের পাশেই। সেখানে তখন সারা বাড়ি নেমে এসেছে। তাতন আর শুভ্র আগেই পৌছল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোকন এসে পৌছল। মেজো কর্তা জীতেনবাবুর হম্বিতম্বি তখন শোনা যাচ্ছে, 'বড়দা, তুমি তো আমার কথা শুনতেই চাওনা। এবার বোঝ ঠেলা। বলাইদা তো আগেই বলে দিয়েছিলেন, এ বাড়িতে এখন অনেক অঘটন ঘটবে।'

বড়দা মানে খোকনের বাবা বেশ বিষণ্ণ মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েরা একপাশে। প্রত্যেকেরই মুখ থমথম করছে। তাতনরা যেতেই নেলী বলে উঠল, 'তাতনদা কাল রাত্রে বাড়িতে ভূত এসেছিল। তারকদাকে গলাটিপে মেরেছে। ওর সব জিভটিভ বেরিয়ে গেছে।'

তাতন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সজলবাবু হাঁই-হাঁই করে উঠলেন, 'না না ক্ষুদে গোয়েন্দা, তোমার ওখানে যাবার দরকার নেই। অপঘাতে মৃত্যু। ছোটরা এখন কেউ ও ঘরে ঢুকবে না।'

তাতন একবার ভারিক্কী চালে সজলবাবুর দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ভেতরে আমার যাবার দরকার আছে। লাশটা আমার দেখার দরকার।'

প্রবল আপত্তি তুললেন মেজকর্তা, 'কেন তুমি কী বাড়ির কর্তা ব্যক্তি যে তোমার দেখার দরকার ? আর দেখারই বা কী আছে ? আরো দুটো হাত বেরুবে নাকি ? তাছাড়া একটু আগেই সবাইকে বার করে দেওয়া হয়েছে।'

এবার খুব বিনয়ের সঙ্গে তাতন বলল, 'না মেজোকাকা, হাত বা পা কিছুই বেরুবে না। তবে এটা বলতে পারি, তারকদাকে ভূতে মারেনি, মেরেছে কোন মানুষই।'

'হোয়াট ? আমরা সব কানা ? কিছু বুঝি না ? এই বয়সে সবজান্তা হয়ে গেছ নাকি ?'

'সব না জানলেও কিছু জেনেছি।'

'কী জেনেছ ?'

'এমন অনেক কিছু যা শুনলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।'

'যেমন ?'

'বলব মেজকা, সময় এলে সব বলব। প্লীজ, আপনি আপত্তি করবেন না। আমায় একবার বডিটা দেখতে দিন।

জীতেনবাবু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ব্রজেনবাবু বললেন, 'ওকে যেতে দাও জীতু, ও একটু দেখবে বৈতো নয়। ওকে দেখতে দাও।'

তাতন একাই ঘরে ঢুকে গেল। শুভ্র আর খোকন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একতলার ঘর। একটা ড্যাম্প ড্যাম্প গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এ ঘরটায় ঠাণ্ডাও যেন একটু বেশী।

পিছনের দিকে একটা জানালা অবশ্য ছিল। কিন্তু সেটা তখনও খোলা হয়নি। তাতন গিয়ে প্রথমেই জানালাটা খুলে দিল। পর্যাপ্ত না হলেও কিছুটা আলো ফিরে এল। তাতেও দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। ও গিয়ে সুইচ অন করে দিল। বরাতজোর তখন লোডশেডিং ছিল না।

একটা খাটিয়ার ওপর তারকদার দেহটা পড়ে আছে। কম্বলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। তাতন এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। জিভটা বেরিয়ে এসেছে। কষের গা বেয়ে লালা জাতীয় পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে, চোখ দুটো বিভৎস হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। নীল ব্যানার্জীর কায়দায় ও অনেকক্ষণ এপাস ওপাস থেকে বডিটা ভালো করে দেখছিল। খুব তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে গলাটা দেখে নিজের মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ভরাট গলার শব্দে ও ফিরে তাকাল। বলাইবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, 'কী বুঝছ ?'

তারকদার দেহটার দিকে আবার চোখ ফিরিয়ে এনে ও বলল,' আপনি বডিটা দেখেছেন ?'

'না, খবর শুনে এই মাত্র এলাম।'

বলাইবাবু এগিয়ে এলেন। তিনিও অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন।

এবার তাতন প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বলাইজেঠু, আপনার কী মনে হয় তারকদাকে ভূতে মেরেছে ?'

পাল্টা প্রশ্ন, 'তুমি কী মনে কর ?'

'আপনি বিজ্ঞ এবং প্রবীণ মানুষ। আপনিই বলুন না।'

'মারতে পারে। মৃত্যুটা অপঘাত।'

'তারমানে বলতে চাইছেন কোন মানুষ নয় রাজুকাকার প্রেত এসে মেরে গেছে ?'

বলাইবাবুর মুখ গম্ভীর। সহসা এ প্রশ্নের কোন জবাব তিনি দিলেন না। তাতনও আর কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে এল।

আবার সজলবাবুর টিপ্পনী, 'হোল গয়েন্দাগিরি ?'

কিছু না বলে তাতন ব্রজেনবাবুর কাছে গিয়ে বলল, 'মেসোমশাই, পুলিসে খবর দিয়েছেন ?'

জিতেনবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তাতনের পাকামীতে প্রচণ্ড রেগেছেন।

এবার যেন খেঁকিয়ে উঠলেন, 'পুলিস ? পুলিস কী করবে এখানে এসে ?'

তাতন বলল, 'হ্যাঁ মেজকা, পুলিসের আসা দরকার ?'

'কেন ?'

'এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু।'

'সেতো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অপঘাত। অশরীরী আত্মার কার্যকলাপ। তাতে পুলিস কী করবে ?'

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক মৃত্যু কিন্তু কোন প্রেত বা ভূতের কাজ নয়—করেছে কোন মানুষ।

হঠাৎ রমলা দেবী বললেন, 'কী বলছিস তুই তাতন ?'

'হ্যাঁ মাসীমা। এটা খুন।'

অস্ফুটে ব্রজেনবাবু বললেন, 'খুন ? তারক খুন হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। এবং পুলিস এসে ঠিক এই কথাই বলবে। মেসোমশাই আপনি পুলিসে খবর দিন। সেটাই আপনার করা উচিত।'

আবার সজলবাবুর টিপ্পনী, 'বোঝো, বড়দার কী করা উচিত সেটাই এখন ঐ ক্ষুদেগোয়েন্দার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

তাতন এমনিতে খুবই সংযত এবং ভদ্রছেলে। চট্ করে ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মুখের ওপর কোন কথা বলে না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ও আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, 'হ্যাঁ সজলবাবু, এই ক্ষুদে গোয়েন্দা জীবনে বেশ কয়েকটা অস্বাভাবিক মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছে, যেটা আপনি দেখেননি। আমি প্রমাণ দিতে পারি এটা খুন। যে কোন একজন মানুষের করা।' আর পোষ্টমর্টম হলে আমার কথা সত্যি বলে প্রমাণ হবে।'

'আছি কোথায় ? জামাইবাবু, চলুন কেটে পড়ি। এরপর তো ক্ষুদে গোয়েন্দা প্রমাণ করে দেবে খুনটা আমাদের মধ্যেই কেউ করেছে।'

জীতেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তাই চল, এ সব বাঁদরামী আর সহ্য হচ্ছে না। বড়দার আস্কারায় এরপর আর মান ইজ্জত থাকবে না।'

ওরা গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলাইবাবুর গলা পাওয়া গেল, 'ব্রজেন, ছেলেটার কথা উড়িয়ে দিওনা। তুমি পুলিসেই খবর দাও।'

যারা চলে যাচ্ছিল তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল। জীতেনবাবুই আবার বললেন, 'কী বলছ তুমি বলাই দা ? তুমিও কী বিশ্বাস করো এটা খুন ? মানুষের কাজ ?'

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কথাটা যখন উঠেছে, তখন সেটাই করা উচিত। নইলে পাঁচজন লোক পাঁচ কথা বলবে। আর পুলিস ইনভেস্টগেশনে যদি জানা যায় এটা কোন মানুষের কাজ নয় তাহলে তোমাদের ইজ্জত বাঁচবে।'

ব্রজেনবাবু আর দাঁড়লেন না। বোধহয় তিনি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাতন একটা প্রশ্ন করল, 'মেশোমশাই আপনাদের কালো কোথায় ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবই 'কালো নামধারী সে বিরাট কুকুরটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাতনের কথায় সবার হুঁশ ফিরে এল। ব্রজেনবাবুই বললেন, 'আরে তাইত, সকাল থেকে তো তার কোন সাড়াশব্দ নেই।'

এমনিতে চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করে।'

খোঁজ শুরু হয়ে গেল কালোর। কালোকে অবশ্য অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল তার নির্ধারিত ঘরে। এবং সেখানেও বিস্ময়। কালো ঘুমচ্ছে। মড়ার মত। প্রায় নিঃসাড়ে।

তাতন কেবল গম্ভীর মুখে বলল, 'হতেই হবে। নইলে তারকদাকে খুন করা সম্ভব হত না।'



বদ্রীনাথজীর মন্দিরে একটা সিঁড়িতে বসেছিল তাতন। পাশে শুভ্র। খোকন একা বাড়িতে রয়েছে।

খামে আঁটা চিঠিটা আবার খুলে তারকদার মৃত্যুর খবর জানিয়ে তাতন চিঠিটা পোষ্ট করে দিয়েছে সকালেই। কে জানে নীলকাকু কবে চিঠি পাবে। এই মুহূর্তে ও বড় বেশী করে নীলকাকুর অভাব অনুভব করছিল। ওর মনে এখন প্রশ্নের পাহাড়। গতকাল সকাল থেকে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। পোড়ো দুর্গ। রহস্যময় একটা মুখ। তারপর বাড়ি ফেরার পর গত রাতের রহস্যময় ভূতের মুখোশ পরা মানুষ। রাজুকাকার ঘরে সে কিছু খুঁজছিল। কী তা সে জানে না। কিন্তু সেই লোকটাকে চিনত তারকদা। আজ সন্ধ্যেবেলা তারকদার সঙ্গে এখানেই দেখা হবার কথা ছিল। অনেক কিছু তারকদা বলবে বলেছিল। কিন্তু তারকদার মুখ থেকে আর কিছু শোনা যাবে না। তবে কী তারকদার মৃত্যুর কারণ এটাই? তাহলে তারকদার একটা কথা ঠিক। গতরাতে তারকদা বলেছিল, 'ওর চোখ সবখানে। কে জানে এখনি আমাদের সব কথা শুনেছে কিনা?' হয়ত তাই। আর সেই কারনেই লোকটা আর তারকদাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইল না। আফশোষে তাতনের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। তারকদা যদি অন্তত কানে কানেও নামটা বলে যেতে পারত! কিন্তু এখন উপায়? রাস্তা কী? কুকুরটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। হেভি ডোজের ঘুমের ওষুধ দিয়ে। ওটা জেগে থাকলেও কাজ হত। ওদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। নাঃ সব দিকেই রাস্তা বন্ধ।

হঠাৎ শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, 'কী ভাবছিস?'

'অনেক কিছু?'

'কী রকম?'

'খুনটা এ বাড়িতে এই প্রথম নয়। খুব সম্ভবত রাজুকাকাকেও খুন করা হয়েছে।'

'তার মানে?'

ঠিক শুভ্রর কথার উত্তর নয়। তাতন যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল, 'গভীর রাতে কঙ্কালের মুখোস পড়ে রাজুকাকার দেওয়ালে অজস্র হিজিবিজি লেখার মধ্যে কী খুঁজছিল? মৃত্যুর আগে রাজুকাকা খোকনকে বলেছিলেন তিনি এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন; যা শুনলে সবার তাক লেগে যাবে। আবিষ্কার যাই হোক, একজন মৃত বৈজ্ঞানিকের ঘরে সবার অলক্ষ্যে লোকটা খুব সম্ভবত সেই আবিষ্কারের কোনকিছুই খুঁজতে চাইছিল। তারকদার খুন হবার কারণ তারকদা লোকটাকে চেনে। কিন্তু দুর্গে বাঁশী বাজানোর কারণ কী? দুর্গের সঙ্গে এবাড়ির কী সম্পর্ক? এ বাড়িতে ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করার কারণ কী?'

তাতনের কথা শুনতে শুনতে শুভ্র বলল, 'আচ্ছা, একটা কারণ কী হতে পারে না, যে কোন কারণেই হোক ভূতের ভয়টয় দেখিয়ে লোকটা খোকনদের বাড়িটা খালি পেতে চাইছে যাতে করে তার খোঁজার কাজটা নির্বিঘ্নে ঘটে?'

'নিশ্চয় পারে। সেটাই যুক্তিগ্রাহ্য। আর তার ফলটা তো ফলতে চলেছে।'

'কী রকম?'

'মেজকা মানে জীতেন সেন তো এখুনি পারলে এখুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চান।'

'আচ্ছা এই সজলবাবু লোকটা কী রকম বলত?'

'আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—এটাই বলা যায়?'

'কেন?'

'কী করে বলব বল! চ, অনেক রাত হল, মাথায় কিছু আসছে না। একবার বলাইবাবুর জ্যোতিষ চেম্বারে গেলে হত।'

'কী হবে? ও লোকটা তোকে কোন পাত্তা দেবে না।'

'আজ সকালে দিয়েছিল।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা বাজারের রাস্তায় পড়ল। দুপাশে বাজার দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল টাওয়ার চকের দিকে। টাওয়ার চকের বাঁ দিকে পোস্টাপিস। ওরই পাশে জ্যোতিষ বলাই মুখার্জীর চেম্বার। চেম্বারে ঢোকার আগে শুভ্র জিজ্ঞাসা করল 'তোর কাউকে সন্দেহ হয়?'

'সবাইকেই। মেসোমশাই, মেজকা, সজলবাবু, বলাইজ্যেঠু'

'কেন বলাইজেঠু কেন? বলাইজেঠু তো ওদের কেউ নয়?'

'বলাইজেঠুকে আমরা কতটুকু চিনি? তাঁর দুরভিসন্ধি থাকবে না এ কথা

কে বলল তোকে ? ভুলে যাস না রাজুকাকা অন্য কাউকে পাত্তা দিতেন না—কিন্তু ওঁর ঘরে বলাইজেঠু প্রায়ই যেতেন।'

চেম্বার এসে গিয়েছিল, আর কোন কথা হল না। সুখের কথা বলাইবাবু একাই ছিলেন। তাতন যেতেই, বলাইবাবু কিন্তু প্রথম দিনের মত খেদিয়ে দিলেন না। বরং উল্টো ব্যবহার করলেন। তাতনকে দেখেই বেশ সস্নেহে বলে উঠলেন, 'এসো এসো মাস্টার তাতন দি ক্ষুদে গোয়েন্দা।'

তাতন বলল, 'ঠাট্টা করছেন ?'

'না। এখন অন্তত করছি না। তোমার চোখ আছে। সকালেই প্রমাণ পেয়েছি।' 'তুমি জোর না করলে শেষ পর্যন্ত এটাও 'ওয়াজ ফিল্‌ড্‌ বাই ঘোষ্‌ট্‌' হয়ে যেত। তারকের গলায় স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে। তবে আমার ফোরকাষ্ট কিন্তু মিলে গেছে। আমি আগেই বলেছিলুম, বাড়ির গ্রহ পরিস্থিতিটা ভালো নয়।'

'আপনার কী মনে হয় আরো কিছু ঘটবে ?'

'সময় খুব খারাপ কিছু ঘটা বিচিত্র নয়।'

'আচ্ছা, এখনও কী আপনার মনে হয় ও বাড়িতে ভূতের ব্যাপার স্যাপার আছে ?'

'দেখো, আমি জ্যোতিষ মানুষ। ভূতে আমার অবিশ্বাস নেই। অশরীরী আত্মার প্রকোপ বা রোষ থাকতেই পারে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় কোন অশরীরী আত্মা তার নিজের প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করে কোন মানুষের ওপর ওপর ভর করে।'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন তারকদার খুনটা কোন মিডিয়ামের সাহায্যে করা হয়েছে ?'

'হলেও আশ্চর্য হব না।'

'কিন্তু কাল রাতের ঘটনাটা শুনলে আপনি এ কথা বলতেন না।'

'কাল রাতের ঘটনা ? মানে, রাত্রে আবার কিছু ঘটেছিল নাকি ?'

'হ্যাঁ। আর সেটা ঘটেছে আমার সামনেই !'

'সে কী ? ওরা তো আমায় কিছু বলল না ?'

'একমাত্র তারকদা আর আমি ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না।'

'কী রকম ? ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তাহলে শুনতেই হয়। দাঁড়াও তার আগে একটু চায়ের কথা বলি। ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে।'

চা খেতে খেতে তাতন বলতে শুরু করল ওর গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা।

কেবল নীলকাকুকে চিঠি লেখার কথাটা ও ইচ্ছে করেই বাদ রাখল। গভীর মনোযোগ দিয়ে বলাইবাবু সব কিছু শুনলেন। তারপর পকেট থেকে একটা রূপোর নস্যি কৌটো বার করে এক টিপ নস্যি নিতে নিতে বললেন, 'তাহলে তো এখন মনে হচ্ছে ভূট টুত সব বাজে কথা। ভূতটা সাজানো হয়েছে।'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কে করতে পারে এ কাজ?'

'জানি না। তবে আমাকে একবার ঐ পোড়ো দুর্গটায় যেতে হবে।'

'ঐ দুর্গে তুমি গিয়েছিলে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আর শুভ্র কাল ওখানে গিয়েছিলুম।'

'বাবা, তোমার সাহস আছে। তা ঐ পোড়ো দুর্গটা এর মধ্যে ঢুকছে কেন?'

'আমার কেমন যেন কেবলি মনে হচ্ছে ঐ দুর্গের মধ্যেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। বার বার ওখান থেকে বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসে কেন?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ বাঁশীর আওয়াজও ক্রিয়েটেড!'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি আমি বিশ্বাস করি না।'

হুঁ, বলে বলাইবাবু বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'মাই এজ ইজ আ ফ্যাক্টর। নইলে আমারও ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে একটু লেগে পড়তে।'

'আসুন না, তাহলে আমিও একটু বল পাই। একা একা!'

'আমার বয়েস কত জান? পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। পারব ঐ ধকল সামলাতে?'

'কেন পারবেন না। আসল কথা ইচ্ছে। ওটা থাকলে সব হয়?'

'বলছ?' বলেই মিটিমিটি হাসলেন বলাইবাবু। তারপর কী যেন ভেবে বললেন, 'বেশ যাব। আর কিছু না হোক, দুর্গের কথা লোক মুখে শুনেছি। কোন দিন চোখে দেখা হয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে কোন ইনটারেস্টও ছিল না। তোমার দৌলতে নয় একটা পোড়ো দুর্গ দেখা হবে। কবে যাবে?'

'আর কিছু অঘটন ঘটার আগে। অন্তত আরো দু একবার বাঁশীটাশীর আওয়াজ, নিদেন পক্ষে সেন বাড়িতে একটা ভূত।'

'তাহলে বলছ অঘটন কিছু ঘটবে?'

'আপনার জ্যোতিষ শাস্ত্রই তো বলছে —ঘটবে, কিছু ঘটবে।'

'বেশ, আমাকে অন্তত একদিন আগে জানিও। তবে, আমি বাপু একটা কিছু অস্ত্র সঙ্গে নোব। ধরো একটা ছুরি বা লাঠি।'

'লাঠি একটা আপনাকে নিতেই হবে। ওটা মাস্ট।'

আরো দু একটা মামুলী কথার পর তাতন উঠে পড়ল। উইলিয়ামস্ টাউনের দিকে যেতে যেতে তাতন একবার বলল, 'নীলকাকু প্রায়ই বলে, যে কোন খুন জখমে একটা না একটা সূত্র খুনী অকুস্থলে ফেলে আসে।'

শুভ্র বলল, 'তারকদা মার্ডারেও সে রকম সূত্র পেয়েছিস নাকি ?'

কিছু না বলে তাতন একবার মুচকী দিয়ে হাসল।

আরো কিছু দূর যাবার পর শুভ্র বলল, 'বলাই জেঠুকে দুম করে এতো কিছু বলে ফেললি ?'

তাতন একবার শুভ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলাটা উচিত হ'ল না বলছিস ? কে জানে ?



দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। সেন বাড়ি থমথম করছে। জীতেনবাবুর মুখে রা নেই। সজলবাবুও ঠাট্টা টিপ্পনি কাটছেন না। কারণ পুলিস রিপোর্ট-এ তাতনের কথাই ফলে গেছে। তারকদা ওয়াজ ব্রুটালি মার্ডারড্। কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। তাতনও খুব নিশ্চুপ। ও প্রায় ঘর ছাড়াই হয় না। খোকনের খাটে বসে ও এক মনে নিজের ডাইরিতে আঁক জোক কষে। শুভ্র বা খোকনের সঙ্গেও তেমন কোন কথা বলে না। ও যে বেশ চিন্তিত তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। ওর সব থেকে বড় চিন্তা, নীলকাকুর কাছ থেকে ও কোন চিঠি পায়নি। চিঠিটা নীলকাকু পেয়েছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই এক সপ্তাহের মধ্যে দু দিন রাত্রে বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেছে। সেন বাড়ির ভূতুড়ে আতঙ্কে ভোগা (একমাত্র ব্রজেনবাবু ছাড়া) মানুষগুলো সবাই শুনেছে। মেজোকাকা জীতেনবাবু আপাতত গৃহছাড়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ পুলিসের হুকুমে এ বাড়ির কোন লোকই স্টেশন লীভ করতে পারবেন না। জেরা টেরা হয়ে গেছে। তদন্ত পুরোদমে চলছে।

ঠিক এক সপ্তাহ পর, তাতন ওর আঁক জোকের ডায়েরি থেকে মুখ তুলে বলল, 'শুভ্র তুই এখুনী বলাই জেঠুর কাছে চলে যা। পূর্ণিমা পড়ে গেছে। চাঁদের

আলোটা কাজে লাগবে। বলাই জেঠুকে বলে আসবি আগামী কাল রাত্রে আমরা পোড়ো দুর্গে যাব। উনি যেন একটা টর্চ আর একটা লাঠি নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। আমরা ওঁকে ওঁর চেম্বার থেকে তুলে নোব।'

তাতনের সিদ্ধান্তে খোকন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। শুভ্র চলে গেলে ও বলল, 'আবার যাবি? ঐ দুর্গে?'

'যেতেই হবে। নইলে খুনীকে ধরা যাবে না।'

'তারকদার হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছিস?'

'মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু দুর্গে কেন?'

'দুর্গটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। খুনীর পক্ষে। আর খুনীকে আমার খুব ভুল না হলে ওখানেই পাওয়া যাবে।'

'তোর নীলকাকু থাকলে খুব ভলো হত। ওর কাছে রিভলবার আছে।'

'সেটা হলে ভালোই হত। তবে আমি ক্যারাটে জানি। সঙ্গে আবার লাঠিও থাকবে। তুই শুয়েই থাক। মনে হচ্ছে এবারের দুর্গ যাত্রায় কিছু ফল হতে পারে।'

'তোর সঙ্গে কে থাকছে?'

'বলাইজেঠু থাকছেন। শুভ্র থাকছে।'

'বলাই জেঠু তোর সঙ্গে যাবেন? এই বয়েসে, ঐ দুর্গম জায়গায়?'

'হ্যাঁ যাবেন। লোকটাকে যা ভেবেছিলুম তা নয়। সজলবাবু বা মেজকার মত অত গোঁড়া নন। তাছাড়া উনি এই বয়েসেও বেশ সাহসী। গায়ে জোরও আছে। তাছাড়া দলে যত লোক পাওয়া যায় ততই ভাল।'

খোকন তবু গাঁই গুঁই করতে থাকল, 'একা এত রিস্ক নিবি? অন্তত পুলিসে একটা খবর জানিয়ে রাখা ভালো।'

পুলিস আমাকে পাত্তাই দেবে না। তবে তোকে বলে যাচ্ছি, আমরা কাল রাত্রে যাব। যদি পরশু সকালের মধ্যে না ফিরি তাহলে মেসোমশাইকে বলিস পুলিসে খবর দিতে। জানিনা, ওখানে গিয়ে ঠিক কী ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে। হয়ত দেখা যাবে কিছুই হবে না।'

এরপর আর এনিয়ে কোন কথাবার্তা হল না। তাতন আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেল। সেদিন রাত্রে সেন বাড়িতে আর কোন ঝামেলা হল না। বাঁশী টাঁশীরও কোনো আওয়াজ নেই। সব কিছুই কেমন যেন চুপচাপ একটা থমথমে ভাব।

পুরো চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল বিনা উপদ্রবে। তারকদার কেস পুলিস কতটা কী ভাবছে বা এগুচ্ছে তা জানার উপায় নেই। পি. এম রিপোর্টও তাতনের জানা সম্ভব হয়নি। কারণ পুলিস তাতনের বয়েসী কোন ছেলেকে কোন পাত্তাই দেবে না।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ, সেন বাড়ির সব মানুষেরা যে যার ঘরে চলে গেছেন। চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কালোর গলার ঘেউ ঘেউ ছাড়া আর সব চুপচাপ। তারকদার অপঘাত মৃত্যু বাড়িতে বেশ থমথমে অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

তাতন আর শুভ্র নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছে। চড়া শীতের জন্যে সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। হাতে টর্চ আর লাঠি। খোকনকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় বেরিয়ে ঠাণ্ডাটা আরো বেশী মালুম দিল। শীত বেশী পড়ায় রাস্তায় লোকজনও কম। ওরা যখন বলাইবাবুর জ্যোতিষাগারে এসে পৌঁছল তখন রাত প্রায় দশটা। অফিসঘর বন্ধ ছিল। টুকটুক আওয়াজ করতেই দরজা খুলে বলাইবাবু বেরিয়ে এলেন। আজ বলাইবাবুর পরণে গরমের ট্রাউজার, পুলওভার, ওভারকোট, পায়ে সু, গলায় মাফলার, কানচাপা টুপি। কাঁধে একটা ব্যাগ। ব্যাগে কী আছে কে জানে। তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'রেডি ?'

'হ্যাঁ, চল, দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়ে পড়ি। বেঁচে ফিরে এলে লোক ডেকে ডেকে গল্প করা যাবে।'

দুর্গে যাবার রাস্তা তাতনের চেনা হয়ে গিয়েছিল। তফাৎ, সেদিন ছিল পরিপূর্ণ দিবালোক। আর আজ পূর্ণচন্দ্রালোক। জঙ্গলে ঢোকার আগে পর্যন্ত তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে বলাইবাবু মোটামুটি বয়স্ক মানুষ। বারে বারেই পিছিয়ে পড়ছিলেন। তারওপর ওনার আবার চশমা আছে। কিন্তু সেই ঘন ঝোঁপ আর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই বলাইবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাতন এগিয়ে গিয়েছিল সবার আগে। হাতের লাঠিটা দিয়ে ডালপালা সরাতে সরাতে ও এগুচ্ছিল। কিন্তু বলাইবাবুর ডাকে ওকে থামতে হল।

'ও তাতন, এতো ভীষণ জঙ্গল হে। ডালপালার ফ্যাকরা এমনভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে—এগুবো কী করে ?' তারওপর এবড়ো খেবড়ো মাটি।

তাতন আবার পিছিয়ে এল। সত্যিই বলাইবাবুর পক্ষে রাতের বেলা এ পথে হাঁটা কষ্টকর। যতই চাঁদের আলো থাক। দিনের আলোর মত উজ্জল তো নয়। তারওপর মাথার ওপর ঘন গাছপালা। যেটুকু আলো পড়ছে তা চলার পক্ষে আরো দুর্গম হয়ে উঠছে।

'শুভ্র, তুই ওঁর হাতটা ধর। একদম পাশে পাশে থাকবি। কিছুটা রাস্তা একটু কষ্ট করেই যেতে হবে। তারপর অবশ্য এত জঙ্গল নেই।'

বলাইবাবুর আঁতে বোধহয় ঘা লাগল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রাখতো ছোকরা! ভাবটা কী আমায়? পঞ্চাশ বছর বয়স এমন কিছু না। নেহাৎ অভ্যাস নেই, তাই।'



এক হাতে টর্চ জ্বালিয়ে, অন্য হাতে লাঠি দিয়ে গাছপালা সরাতে সরাতে এক সময় ওরা সেই জঙ্গল পার হয়ে মাঠের মধ্যে এসে পৌঁছল। চাঁদের আলো

পড়ে দূরের দুর্গটা সত্যিই রহস্যময় লাগছিল। তারওপর হাল্কা কুয়াশা থাকায় পোড়ো দুর্গ শিল্পীর হাতে আঁকা রহস্যছবি হয়ে উঠেছিল। সেই রহস্য আরো বেড়ে গেল, যখন দুর্গ থেকে হাল্কা বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আবার বলাইবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

'তাতন, শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কী ভয় লাগছে?'

'না, ঠিক ভূতের ভয় নয়। ভয়টা সাপের। বাঁশীর আওয়াজে সাপেরা বেরিয়ে পড়ে।'

বলেই উনি হুশহাস শব্দ আরম্ভ করে দিলেন।

'বেশী শব্দ করবেন না, এদিকে শেয়াল টেয়াল থাকতে পারে। আর প্রায় এসে গেছি। ঐ যে দেখছেন সাঁকোটা—' বলেই শুভ্র 'আঁক' শব্দে চুপ করে গেল। ওর মুখচোখে তখন ভয়। গলায় আওয়াজও কেমন যেন পাল্টে গেল। প্রায় ফিসফিস করে ও বলে উঠল 'তাতন··· দেখেছিস?'

'কী?'

'ওই দ্যাথ। ভালো করে সাঁকোটার দিকে তাকা'

তিনজনেই তাকালো। তিনজনেই এবার স্পষ্ট দেখলো লম্বা কালো আলখাল্লা গায়ে একটা মানুষ সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে দুর্গটার দিকে যাচ্ছে।

জ্যোৎস্না রাতে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দূরের ছায়াছায়া গাছপালাময় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলে একটা ঘোর লাগে। চারিদিক কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। তারওপর সে জায়গায় যদি থাকে একটা মাথা উচু পোড়ো দুর্গ। আর সেই দুর্গের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় কোন রহস্যময় মানুষ—অতিবড় সাহসীরও বুক তখন দুরদুর করে ওঠে। তাতনের মত সাহসী ছেলেও কয়েক মুহূর্তের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কী যেন মনে হতে ও বলল, 'আচ্ছা, এ সেই পাগল নয়তো?'

বলাইবাবুর মুখেও ভয়ের স্পষ্ট ছায়া। পরিস্থিতির গুরুত্বে তিনিও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রা শুরুর মুখে তিনি 'হও ধর মেতে বীর' গানটা ধরেছিলেন গুন গুন করে। কিন্তু এখন আর কোন গান টান নেই। উনি বললেন, 'পাগল? এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় 'নাইট ওয়ার্ক' করবে? পাগলেও আগুনে ভয় পায়। ঠাণ্ডায় কাঁপে।

'বলা যায় না। পাগলের খেয়াল যুক্তিতে আসে না, চলুন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সাঁকোর কাছে এসে পড়ল। কিন্তু কোন জন মনিষ্যির দেখা পাওয়া গেল না। অদ্ভুত একটা গা ছমছমে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। বাঁশীর আওয়াজটাও এখন থেমে গেছে। কেবল কনকনে হাওয়া আর কুয়াশাময় জ্যোৎস্না চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পোড়ো বাড়িটা, দূরের গাছপালা, চারিদিকে পরিবেশ, কী যেন এক অজানা আশঙ্কায় থমথম করছে।

'এবার কী তাহলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে?'

'যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে বাইরে অপেক্ষা করতে পারেন।'

'পাগল নাকি?'

'কিন্তু লোকটা কে? পাগল না অন্য কেউ? সব থেকে মজার ব্যাপার বাঁশীর আওয়াজটাও এখন থেমে গেছে।'

'তুমি এখনও মজা পাচ্ছ তাতন! এখান থেকে ফিরে গেলে তোমার বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ডেঞ্জারাস ছেলে তুমি। ঢোকার রাস্তাটা কোন দিকে?'

'ওই তো সামনেই বিশাল দরজা। অবশ্য অত বড় দরজাটা বন্ধই থাকে। দরজার লাগোয়া একটা ছোট দরজা আছে। ওটা আগের দিন খোলাই ছিল। কেউ যদি বন্ধ টন্ধ না করে থাকে তাহলে ঢুকতে অসুবিধা হবে না।

'তার আগে একটা কাজ করা যাক। বাড়ির পিছন দিকটা একবার দেখে এলে হত।'

এবার শুভ্রর কণ্ঠে একটু আপত্তির সুর, 'আবার পিছন দিকে কেন? আসলে তুই কী করতে চাইছিস বলত?'

তাতন বলল, 'আমি নিজেই জানিনা। কেবল দেখতে চাইছি, বাড়ির মধ্যে কেউ থাকে কিনা? বাঁশীটা বাজায় কে? কেনই বা বাজায়? সেদিন যে একটা বিভৎস মুখ এক লহমার জন্য দেখেছিলুম সেটা কী? কার মুখ সেটা? এই রকম অনেক কিছু জানার ইচ্ছে।'

'কিন্তু এ সবের উত্তর পেলে কী সেন বাড়ির রহস্যের সমাধান হবে?'

তাতন সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কী হবে বা হতে পারে তা জানিনা। তোদের যদি ইচ্ছে না থাকে তোরা যাস না। আমি একাই যাচ্ছি।'

ও আর কোন কথা না বলে দুর্গ প্রদক্ষিণ করতে এগিয়ে গেল। অগত্যা বাধ্য হয়েই বলাইবাবু আর শুভ্রকে এগিয়ে যেতে হল। দুর্গের পিছন দিকটা রীতিমত দুর্গম। খুব সম্ভবত এ দিকটায় বহুবছর কারো আসা যাওয়া নেই। এদিকে জঙ্গল আরো ঘন। খুব একটা বেশীদূর যাওয়া গেল না। কোন বুনো জন্তু অথবা

সাপটাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাধ্য হয়েই ওদের ফিরতে হল। সব থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। বিশাল একটা বট সম্পূর্ণভাবে দুর্গের পিছন দিকটা গ্রাস করে নিয়েছে। বটের ডালপালা বাড়ির দরজা জানলা এমন কী দেওয়াল ভেদ করে লম্বা শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে বাড়ির মধ্যে। যেটা এর আগের দিন দোতলার সিঁড়িতে ওঠার সময় তাতনরা আবিষ্কার করেছিল।

ওরা আবার প্রধান ফটকে ফিরে এল। বড় দরজা পার হয়ে তিনজনেই ঢুকে গেল দুর্গ সংলগ্ন চত্বরে। চত্বর পেরিয়ে মূলবাড়ি। গত দিনের তুলনায় এই দুপুর রাতে বাড়িটা আরো বিভৎস মনে হচ্ছিল। আরো দুর্গম, আরো ভয়াবহ, আরো রহস্যময়। কাছাকাছি কোথাও ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কিছু শব্দ ছিল না। মনে হচ্ছিল পাতাল পুরীর কোন খানাখন্দে ওরা এসে পড়েছে। অন্ধকার এতই ঘন যে তিন জনের তিন জনকে দেখতেই অসুবিধা হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলাইবাবু বললেন, 'এখানে আর কী দেখবে তাতন, কোন জ্যান্ত মানুষের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। চল ফিরি।'

বোধহয় শুভ্ররও তাই ইচ্ছা। সেও বলল, 'উনি ঠিকই বলেছেন তাতন। এখানে কিছু থাকতে পারে না।'

একটু বিরক্ত হয়ে তাতন বলল, 'কিন্তু সেদিন আমরা একটা মানুষের রক্তাক্ত মুখ দেখেছিলাম।' 'সে তোমার দেখার ভুল তাতন, আমি হলফ করে বলতে পারি—এখানে এই ভয়ানক পোড়ো বাড়িতে কারো পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়।'

বোধহয় বলাইবাবুর কথা তখনও শেষ হয়নি। অদ্ভুত একটা 'ক্যাঁচ' শব্দে তিনজনেই প্রায় চমকে উঠল। অনেক দিনের পুরনো দরজা খুললে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক তেমন। আর আওয়াজটা খুব সম্ভবত দোতলা থেকেই যেন ভেসে এল।

তিনজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার সেই একটানা ঝিঁঝির শব্দ। তাতনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কি করা উচিত। ঠিক তখনই আবার সেই 'ক্যাঁচ্' শব্দ। এবং এবারের আওয়াজ আরো দীর্ঘস্থায়ী। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই হু হু শব্দে হাওয়া। খুব সম্ভবত বাড়ির প্রধান ফটক দিয়েই ঢুকছে। পোড়ো দুর্গের নিচের তলায় এমনিতেই কনকনে ঠাণ্ডা। ওদের হাত দুটো নাকের ডগা সব বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারওপর বলা নেই কওয়া নেই দমকা বাতাস।

ফিসফিস করে তাতন বলল, 'দরজা খোলার আওয়াজ। মনে হল যেন ওপর থেকেই আসছে।'

অন্য দুজনের কাছ থেকে কোন উত্তর এলো না। হঠাৎ তাতন বলল, 'শুভ্র আমি ওপরে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে তোরা আসতে পারিস। বলাইবাবুর কাছাকাছি থাকবি। জেঠু, আপনি কিন্তু সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন। সিঁড়িটা জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা আছে।'

মেঝের ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তাতন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। খুব সাবধানে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ও সেই দোতলার বারান্দায় এসে পৌঁছল। টর্চের স্বল্প আলোয় পথ করতে করতে এগিয়ে চলল খানিকটা আন্দাজে ভর করে, সেই বীভৎস মুখটা সেদিন যে দরজায় দেখেছিল সেখানে। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার দরজাটা সেদিন ছিল বন্ধ, আর এখন সেটা সম্পূর্ণ খোলা। দরজার ওপাশে গভীর অন্ধকার। ওর পিছন ফিরে তাকাবার সময় ছিল না। মুহূর্তের জন্য টর্চের আলো জেলেই ও মিশে গেল সেই দরজায় অন্ধকারের ওপাশে।

ওদিকে শুভ্র তখও সিঁড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। মোটামুটি সিঁড়ির মাঝ বরাবর পৌছে শুভ্র জিজ্ঞোসা করল, বলাইবাবু আপনি উঠতে পারবেন তো ?'

কিন্তু কোন সাড়া নেই। ও আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল জেঠু, কথা বলছেন না কেন, এখানে একটা সিঁড়ির ধাপ নেই, ধরুন আমার হাতটা ধরুন।'

এবারও কোন শব্দ নেই। পিছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। শুভ্র ওর টর্চ জ্বালালো। না, কেউ নেই।

'কী আশ্চর্য গেলেন কোথায় ?' বলেই ও চেঁচিয়ে ডাকল, 'বলাই জেঠু··· বলাই জেঠু···'

কোথায় বলাইবাবু ? কোন চিহ্ন নেই তাঁর। কেবল একটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ আওয়াজ ওর কানে ভেসে এল। মনে হচ্ছিল শব্দ বেশ খানিকটা নিচু থেকে উঠে আসছে। এতক্ষণ তিনজন একসঙ্গে থাকায় শুভ্র তেমন কোন ভয়টয় পায় পায়নি। ও জানত সামনে তাতন আছে পিছনে বলাই জেঠু। কিন্তু সিঁড়ির মাঝ বরাবর এসে ও বুঝতে পারল ; তার সামনে পিছনে কেউ নেই। তাতন হয়ত এতক্ষণ দোতলায় পৌঁছে গেছে। আর বলাই জেঠু পিছনে ছিলেন। তিনিও নেই। ও আবার ডাকল বলাই জেঠুর নাম করে। এ বারেও কোন উত্তর নেই। বদলে সেই গোঙানি। হঠাৎ ও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। আচমকা হাঁউমাউ করে চীৎকার করে উঠল, 'তাতন···তা···তন···।'

পোড়ো দুর্গের মধ্যে কেবল একটা প্রতিধ্বনি উঠল, তাতন···তাতন···। শুভ্র বোধহয় তাড়াতাড়ি সিড়িটা পার হতেই চেয়েছিল। কিন্তু সে সময় ও পেলো না।

হঠাৎ ওর মনে হল বিশমনি একটা পাথর ওর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তেই ও শুনতে পেলো কে যেন হাসছে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে। তারপর ও নিজেও জানেনা ও কোথায় গিয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ দুর্গে একটা শব্দ উঠল 'ধপ্'।

বিকট হাসির শব্দটা তাতনের কানেও পৌছেছিল। কিন্তু তখন আর কোন রাস্তা ছিল না। কারণ অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে এগোতে এগোতে ও এসে দাঁড়িয়েছিল একটা সুড়ঙ্গ পথের মুখে। সুড়ঙ্গটা নেমে গেছে নিচের দিকে। সুড়ঙ্গ মুখে টর্চ ফেলে ও দেখল সরু একটা সিড়ির ধাপ অনেক নিচে নেমে গেছে। টর্চের আলো অতদূর পৌছয় না। ও যখন ভাবছে এখন কি করা উচিত ঠিক তখনই শুনতে পেলো ঝোড়ো বাতাসের মত হাসির আওয়াজ। হাসির আওয়াজ থামলে ও একবার শুভ্রর নাম ধরে ডাকল। কোথায় শুভ্র ? পিছনে একরাশ অন্ধকার। আবার সেই 'ক্যাচ' শব্দ। এবং সেটা আরো স্পষ্ট। আরো কাছে। টর্চের আলো ফেলতেই দেখল যে দরজা দিয়ে ও এতদূর চলে এসেছে সেটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টর্চ জ্বালিয়েই ও ছুটে গেল দরজার কাছে। কিন্তু ততক্ষণে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। তাতনের অবস্থা দাঁড়ালো ইঁদুর কলে ধরা পড়ার মত। একমাত্র রাস্তা ঐ সামনের পাতালপুরীর সিঁড়ি। বাধ্য হয়ে খুব সন্তর্পনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা শুরু করল। ও জানেনা সিঁড়ির শেষে কী আছে ? কোথায় শেষ তাও জানা নেই। কিন্তু এগোতেই হবে। কেননা পিছনের দরজা বন্ধ।

কতক্ষণ নেমেছিল মনে নেই। হাতঘড়ি দেখার কথাও মনে নেই। ও কেবল নেমেই চলেছে। এ যেন অন্তহীন পাতাল গহ্বরে এগিয়ে যাওয়া।

বেশ কিছুক্ষণ নামার পর ওর মনে হল আর নামার মত কোন সিঁড়ি নেই। আলোটা চারদিক ঘুরিয়ে দেখল, অসম্ভব স্যাঁতসেতে আর শ্যাওলা ধরা ভিজে দেওয়াল চারদিকে। মাথার ওপর নিকষ কালো ছাদ। মাকড়সার জালে চারদিক ছেয়ে আছে।

জায়গাটার পরিধিও খুব স্বল্প। মোটামুটি চার চৌকো একটা ঘরের মত। কিন্তু যেদিকেই টর্চের আলো ফেলছে সেদিকেই নিরেট দেওয়াল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়া ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যাবার অন্য কোন রাস্তা নেই।

এতক্ষণে তাতনের মনে হল সত্যিই সে ইঁদুর কলে ধরা পড়েছে। কারণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেও কোন লাভ নেই। ওখানেও দরজা বন্ধ।

অন্য কোন ছেলে হলে আশু বিপদ সম্বন্ধে চিন্তা করে নির্ঘাত জ্ঞান হারাতো।

কিন্তু অতি বিপদেও তাতন মাথার ঠিক রাখতে পারে। ও সামান্য সময় দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, এখান থেকে কোন পথে বেরুনো যায়। আলো বাতাসহীন ছোট্ট একফালি চৌকো জায়গা। ভাল করে নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধে হচ্ছে। এইভাবে যদি পুরো একদিন তাকে বন্দী থাকতে হয় তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

উপায় ভাবতে গিয়েই ওর হঠাৎ মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা গোঙানীর আওয়াজ ভেসে আসছে। খুব নিবিষ্ট চিত্তে ও কানকে সজাগ করল। না ভুল নয়, কে যেন এক নাগাড়ে গোঙাচ্ছে। আশ্চর্য, তবে কী এখানে তারই মত কেউ বন্দী হয়ে আছে ? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে ? এই তো একফালি জায়গা। যদিও অন্ধকার আর নোংরা, তবুও টর্চের আলোয় সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। না, এখানে তো আর কেউ নেই। তবে আওয়াজ আসছে কোত্থেকে ? খুব সম্ভবত দেওয়ালের ওপাশ থেকে। তার কারণ গোঙানীর আওয়াজটা মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। দেওয়ালের একদিক থেকে শুরু করে ও কান পাততে আরম্ভ করল। বরফের মত কনকনে দেওয়াল। এগুতে এগুতে হঠাৎ ও থমকে দাঁড়ালো। মনে হল পূব দিকের দেওয়ালের ওপাশ থেকে গোঙানীটা ভেসে আসছে। এবং গোঙানীটা কোন মানুষের। তার অর্থ এই দেওয়ালের ওপাশে কোন ঘর আছে আর সেখানে নিশ্চয় কেউ বন্দী রয়েছে। ভূতে গোঙায় কিনা তাতন জানে না। কিন্তু আওয়াজটা নির্ঘাত মানুষের। এখনি ঐ ঘরে যাওয়া দরকার। কিন্তু যাবে কেমন করে ? তার সামনে পিছনে যাবার রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ। হঠাৎ ও প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে ডাকল, 'কে ও ঘরে ?'

তাতন ভেবেছিল, আওয়াজ যখন ওখান থেকে এখানে আসতে পারছে, তাহলে নিশ্চয় এ ঘরের আওয়াজ ও ঘরে পৌছবে। বেশ কয়েকবার ও চিৎকার করল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। গোঙানীর আওয়াজটা বড় একটানা। হঠাৎ ও পাগলের মত হাতের লাঠিটা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে আঘাত করতে শুরু করল। কিন্তু কোন ফল নেই। একটানা গোঙানীটা একই ভাবে গুঙিয়ে চলল।

সাহসী ছেলেটার বোধহয় এতক্ষণে সাহসে কিছুটা চিড় ধরল। এখানে বেশীক্ষণ অথবা বেশীদিন থাকলে তার মৃত্যু হবেই। আর মৃত্যুভয় বড় সাংঘাতিক। অনেক সাহসীরই বুক কেঁপে ওঠে। আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে।

এখান থেকে বেরুনোর কোন উপায় নেই দেখে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করল। কারণ টর্চের আলোও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। একসময় ওটা নিভেও যাবে। আর এ এমন একটা জায়গা, এখানে কোনদিন

আলো বা বাতাস এসেছে বলে মনে হয় না। এখান থেকে হাজার চিৎকার করলেও কেউ তার আওয়াজ পাবে বলেও মনে হয় না।

সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবে এমন সময় আবার সেই প্রাণকাঁপানো 'হাঃ হাঃ, হাসির শব্দ। চকিতে ও টর্চের আলো ছুঁড়ে মারল সিঁড়ির ধাপিতে। আর পরমুহূর্তেই চমকে চিৎকার করে উঠল, 'কে ? কে তুমি ?'

সিড়ির মুখে তখন সেই বীভৎস আর রক্তাক্ত মুখ। তাতনের কথার জবাবে সে আবার হাসল। প্রাণ কাঁপানো নেকড়ের হাসির মত। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে তাই না ?'

তাতন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু তুমি কে ?'

'তোর যম। আমার হতে এটা কী দেখেছিস ? পিস্তল। তোর কোন বাবাই এখান থেকে তোকে বাঁচাতে পারবে না।'

তাতনের সাময়িক ভয়টা ততক্ষণে খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে। রক্তাক্ত মুখটা কোন প্রেতের নয়। ওটা খুব সম্ভবত একটা মুখোশ এবং মুখোশের ওপাশে ভূত নয় প্রেত নয় দানো নয়, একটা মানুষ। রক্তমাংসের মানুষ। তাতন আবার চিৎকার করে বলল, 'আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। আর তোমার হাতে একটা পিস্তল। হয়ত আমাকে মরতে হবে। মরতেও আমি ভয় পাই না, কিন্তু মরার আগে তুমি কে অন্তত সেটা জানিয়ে যাও।'

আবার সেই বীভৎস হাসি। হাসতে হাসতেই লোকটা বলল, 'সে কীরে তুই তো গোয়েন্দা হচ্ছিস। আর আমি কে সেটা বুঝতে পারিসনি ?'

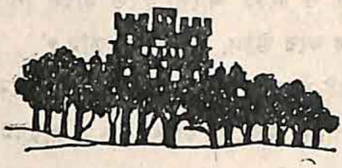
'হ্যাঁ, খানিকটা অনুমান করেছি। তাই আজ এসেছিলুম তোমাকে বামাল সমেত ধরতে।'

'পারলি ? এবার তুই চিন্তাকর, তোর হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে কোন গোয়েন্দা আসবে ? তোর নীল ব্যানার্জী ?'

হঠাৎ তাতনের মধ্যে কী যেন হয়ে যায়! সিড়ির ওপরে দাঁড়ানো অবস্থায় লোকটা খুব দম্ভের সঙ্গেই কথাগুলো বলছিল। স্বাভাবিক কারণেই একটা তাৎক্ষণিক অন্যমনস্কতাও ওর মধ্যে এসেছিল। আর সেটাই ছিল একমাত্র সুযোগ। এক লহমার মধ্যে ও ছুঁড়ে মারল ওর হাতের টর্চটা লোকটার ঠিক মাথা লক্ষ্য করে।

তারপর, তাতন জ্ঞান হারাল একটি মাত্র কারণে। ও স্পষ্ট শুনতে পেলো একটি গুড়ুম শব্দ, তারপর টের পেল একটা প্রচণ্ড গরম কিছু ওর বাঁ উরুর মধ্যে প্রবেশ

করছে। কী তীব্র সে আঘাত। ওর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। 'আঃ' বলে ও মাটিতে পড়ে গেল। আর ঠিক জ্ঞান হারানোর আগে ও আরো একটা শব্দ শুনল, 'গুড়ুম'। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।



অদ্ভুত একটা ঘরের মধ্যে জ্ঞান ফিরল তাতনের। ধীরে ধীরে ও চোখ মেলে তাকাল। একটা তন্দ্রার মত ভাব। তারই মধ্যে বেশ বুঝতে পারল কয়েকটা মুখ ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তারা যেন কী সব কথা বলছে। ভালো করে সব বুঝতেও পারা যায় না। আবার ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ পর ওর একে একে সব মনে পড়তে লাগল। ওর মনে পড়ে গেল পোড়ো দুর্গের চোরা কুটুরীর মধ্যে তাকে একা পেয়ে সেই লোকটা ওকে গুলি করেছিল। গুলিটা লেগছিল ওর উরুতে আর সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার জ্ঞান হারিয়েছিল। হঠাৎ ওর মনে হল কে যেন ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর খুব মৃদু এবং স্নেহকোমল স্বরে বলছে, 'এখন কেমন লাগছে তাতন?' যন্ত্রণা হচ্ছে?'

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ও বুঝতে পারল এ কণ্ঠস্বর তার অতি পরিচিত। অতি প্রিয়। কিন্তু সে এখন কোথায়?

এতক্ষণ তো তার পড়ে থাকার কথা স্যাঁতস্যাঁতে চোরাকুঠুরীর মেঝেতে। কিন্তু, কিন্তু তার বদলে নরম গদী। মাথায় হাত বুলোচ্ছে তার অতিপ্রিয়, অতি পরিচিত, জগতের সব থেকে বিশ্বাসী একটি মানুষ। এ কণ্ঠস্বর নীলকাকুর। নীল ব্যানার্জীর। এ স্বপ্ন না সত্য বোঝার জন্যে ও আবার চোখ মেলল। না স্বপ্ন নয়। নীলকাকু ওর মুখের ওপর ঝুকে রয়েছে। সামান্য হাসল তাতন। তারপর চারদিকে চোখ মেলে দেখল। প্রায় সবাই আছেন। মেসোমশাই, মাসীমা, খোকন, নেলী, সবাই।

মাসীমার গলা পাওয়া গেল, 'ধন্যি ছেলে বাবা' গুলিটা যদি পায়ে না লেগে একটু ওপরে লাগত, উঃ আমি আর ভাবতে পারছি না।'

ব্রজেনবাবুর গলা পাওয়া গেল, 'আঃ রমলা, একটু চুপ কর। ছেলেটার সবে জ্ঞান ফিরেছে। এখনি অত চিৎকার চেঁচামেচি করতে হবে না।'

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ তাতনের মনে পড়ে গেল শুভ্রর কথা। বলাই জ্যেঠুর কথা। ওরাও সেদিন সঙ্গে ছিল। জ্ঞান হবার পর ও প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'শুভ্র ?'

'আছিরে, মরিনি। তবে মাথা ফেটে চৌচির। বেশ কিছু দিন ব্যাণ্ডেজ লাগানো অবস্থায় থাকতে হবে।'

শুভ্রকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে ওর গলার স্বরে আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বলাই জেঠু ?'

'সব ঠিক আছে। তুই এখন ঘুমো। একটু সুস্থ হয়ে নে, তার পর সব শুনবি।'



প্রায় তিন থেকে চারমাসের মত তাতনকে শুয়ে পড়তে হল। গুলিটা গিয়ে লেগেছিল হাড়ে। তিনচার মাসের আগে ওর হাঁটা চলাই বারণ। যশিডি থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওকে স্ট্রেচারে করে তুলে দেওয়া হল। ষ্টেশনে সবাই এসেছিলেন। মেসোমশাই মাসীমা নেলী —সবাই। মাসীমা তো কান্নাকাটি করেই একশা। অবশ্য ফেরার পথে ভাবনার তেমন কিছু ছিল না। নীল ব্যানার্জী আছে। শুভ্র আছে। শুভ্রর মাথায় ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ও মোটামুটি ভালোই আছে।

ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত তাতনের উশখুশুনি থামছিল না। এ কদিন ও প্রায় শয্যাবন্দী। খোকন বা শুভ্রকে কাছে আসতে দেওয়া হত না। সিরিয়াস উণ্ডেড। কমপ্লীট রেষ্ট দরকার। কোন রকম উত্তেজনাও চলবে না। প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর নীল ব্যানার্জীই ওকে নিজের দায়িত্বে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে।

ট্রেনটা ছাড়তেই কিন্তু তাতনকে আর চুপ করিয়ে রাখা গেল না। ও বলল, 'নীলকাকু, আর নয়। এবার তুমি সব কিছু বলত ? তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে ? আমিই বা পোড়ো দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে এলুম ? পোড়ো দুর্গের রহস্য আমার কাছে এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। কেবল আফশোষ আমি কিছু করে উঠতে পারলুম না।'

নীল ব্যানার্জী একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'কে বলল, তুই কিছু করতে পারলি না ? যা কিছু করার সবই তো করেছিস। পোড়ো দুর্গের রহস্য সব শেষ।'

'তার মানে ?'

'তার মানে আর কোনদিন দুর্গ থেকে বাঁশী বাজবে না। আর কোনদিন রাজেন সেনের প্রেত দেখা যাবে না।'

'তুমি আমায় সব খুলে বল। আমার কাছে এখন সব কিছু ধোয়াটে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, সব তোকে বলছি। তুই কিন্তু বেশী কথা বলতে পারবি না। তোর লেখা চিঠিটা আমি ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। আর তখনি মনে হয়েছিল দেওঘরে আমার যাওয়া দরকার এই কারণে যে তোর জীবন বিপন্ন। আমি সরাসরি তোর মেসোর বাড়ি যাইনি। গিয়েছিলাম পুলিস ষ্টেশনে। মিঃ তেওয়ারী মানে ওখানকার থানা ইনচার্জ আমার পরিচিত ব্যক্তি। ওঁকে সব বলতেই উনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন রাতে তোরা যাবার আগে এক লট পুলিস নিয়ে আমি আগেই ওখানে পৌঁছেছিলাম। শুভ্রর মুখে পরে শুনেছিলাম, তোরা নাকি সেতুর ওপর একটা আলখাল্লা পরা লোককে দেখেছিলি। লোকটা আমিই। তুই প্ল্যানটা ভালোই করেছিলি। বলাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলি।'

তাতন চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, 'বলাইবাবুও তাই চেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। চাইবেনই তো। ওকে যে তুই ধরে ফেলেছিস। তোকে তো উনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না।'

'কিন্তু,' এবার শুভ্র বলল, বলাইবাবুই যে তারকদাকে খুন করেছেন এটা তুই বুঝলি কী করে ?'

তারকদার গলাতেই তার প্রমাণ ছিল। মনে আছে, বলাইবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে তোকে একটা কথা বলেছিলুম, খুন করার সময় অনভ্যস্ত খুনীর একটা টেনশন থাকে। যে একটা না একটা সূত্র ফেলে যায়ই। তারকদার গলায় ছিল বেশ কিছু নস্যির গুড়ো। আর ওখানে ঘন ঘন নস্যি নেবার বাতিক ছিল একমাত্র বলইবাবুরই।'

'ভেরী ফাইন ডিটেকশন। খুব ভালো ধরেছিস। তবে তুই বড় বেশী রিস্ক নিয়েছিলি। বলাইবাবুর হাতে অসাধারণ টিপ। টর্চটা ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গেই

উনি গুলি চালিয়েছিলেন। কাঁপা কাঁপা আলোর মধ্যেও তোর পা জখম করে দিয়েছেন। আলো থাকলে বুকটাই এফোড় ওফোড় হয়ে যেত।'

শুভ্র বলল, 'কিন্তু নীলকাকু, তাতন কিন্তু আরো ভুল করেছিল। তারকদা খুন হবার আগের রাত্রে সেন বাড়ির রহস্যময় আগন্তুক সম্বন্ধে ও সবিস্তারে বলাইবাবুর কাছে গল্প বলেছিল অথচ ও জানত, বলাইবাবুই আসল কালপিট।

'নন্তির ব্যাপারে বলাইবাবুকে সন্দেহ করলেও হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট ডেফিনিট হতে পারিনি লোকটা বলাইবাবু না অন্য কেউ। তবে আন্দাজ করেছিলুম, যদি রাজুকাকার ঘরে ঢোকার রহস্যময় আগন্তুক এবং তারকদার খুনী একই লোক হন তিনি আর আমাকে জীবিত রাখতে চাইবেন না। আমাকে সরাতে চাইবেনই। আর সরানোর উপযুক্ত জায়গা ঐ পোড়ো দুর্গ, যেখানে সাধারণ মানুষ বা পুলিস সচরাচর যায় না। ওটা ছিল বলাইবাবুর কাছে আমার একটা বা প্রাভোকেশন। উনি টোপটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন। ওঁকে সন্দেহ করার আমার আরো একটা কারণ, প্রথম দিন উনি আমাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। আমাকে অপমান করে চলে গিয়েছিলেন। সেই তিনিই, হঠাৎ আমাকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়ে ফেললেন কেন? খাতির করে ঘরে বসিয়ে চা খাওয়ালেন। যেটা অতীব বিসদৃশ্য। সে যাই হোক, বলাইবাবু ধরা পড়েছেন তো?'

'হ্যাঁ। তবে উনি বেঁচেও নেই। তেওয়ারির গুলিতে শেষ। বলাইবাবুর সঙ্গে সঙ্গে একটা বংশেরও সমাপ্তি।'

'বংশ?' এবার তাতনের বিস্ময়।

'হ্যাঁ বংশ। আদিত্যনারায়ণের বংশ।'

'আদিতানারায়ণ মানে যার নামে আদিত্যগড়? ঐ পোড়ো দুর্গের অরিজিনাল মালিক?'

'ইয়েস নেফিউ। আর বলাইবাবুর আগাগোড়া জানতে গেলে তোমায় ফিরতে হবে পঁচিশ বছর আগের ঘটনায়।'

'হ্যাঁ, ঘটনার কিছুটা জানি, মানে খোকনের মুখে যেটুকু শোনা।'

'বাকীটা আমি জানি। জেনেছি এখানকার পুরনো পুলিস ফাইল ঘেটে। আদিত্যনারায়ণের একমাত্র ভাই সূর্যনারায়ণ। তৎকালীন জমিদার হিসেবে আদিত্যনারায়ণ খুব ভালো লোক ছিলেন না। প্রজা ঠাঙানো, মদ্যপান এবং অন্যান্য সব রকম অত্যাচার তাঁর রক্তে ছিল। তাঁর বেশ কিছু শত্রুও ছিল। সেই কারণেই এখানে দুর্গমতন ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করে চলে এসেছিলেন। কিন্তু সূর্যনারায়ণ ছিল আরো

বদ। তার চরিত্র ছিল আরো জঘন্য। দাদার সব বদ ব্যাপার স্যাপার তো তার ছিলই, উপরন্তু ছিল টাকা নয়ছয় করার বিলাসীতা। সেই বিলাসীতার জন্যেই সে নিজের সব সম্পদ শেষ করেছিল। তারপর শুরু হল দাদার ওপর চাপ দিয়ে টাকা পয়সা নেওয়া। প্রথম প্রথম আবদার মেটালেও পরে তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ অধিক বয়েসে তিনি সংসারী হতে মনোস্থির করেছিলেন। একটি মেয়েও পছন্দ করেছিলেন। সূর্যনারায়ণ তখন প্রমাদ গোনে। দাদা অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তার ভবিষ্যত মারে কে? তার ওপর তার ধারণাই হয়েছিল ঐ দুর্গের মধ্যে দাদা অজস্র সোনা দানা রূপো, মনিমুক্তো লুকিয়ে রেখেছেন। একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে মত্তপ আদিত্যনারায়ণকে খুন করে সূর্যনারায়ণ। ঐ দুর্গের চত্বরেই। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। পারেনি। পুলিস তদন্তে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ধরা পড়ার আগেই হয় নিখোঁজ। তারপর আর কেউ তার খোঁজ কোন দিনও পায়নি।

সূর্যনারায়ণ ফেরার হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ফেরার হয়ে থাকা কী তার পক্ষে সম্ভব? বিশেষ করে সে যখন অনুমান করত যে ঐ দুর্গেই দাদার গচ্ছিত টাকা পয়সা লুকনো আছে। যেটা সে দাদাকে হত্যা করার পরেও খুঁজে পায়নি।

সূর্যনারায়ণ আবার ফিরে এল। বলাই মুখুজ্যে নাম নিয়ে একটা লোক দেখানো জ্যোতিষাগারও খুলল। ফেরার হওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে সময় কেটে গেছে অনেকদিন। ততদিনে দুর্গের ভগ্নদশা শুরু হয়ে গেছে। গোপনে, অধিকরাত্রে সূর্যনারায়ণ দুর্গটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও এক কপর্দকও পেলো না। সূর্যনারায়ণ ওরফে বলাইবাবুর তখন চোখে মুখে অন্ধকার। উদ্‌ভ্রান্তের মত তখন এদিক ওদিক ঘুরছে। জ্যোতিষি বিদ্যেটা হয়ত কোন এক সময়ে শিখেছিলো। কিন্তু তা দিয়ে কী হবে? তার চোখে বিপুল অর্থের নেশা। কে জোগাবে অত টাকা? ঠিক এই সময়ে আলাপ হয়ে গেল সেনবাড়ির সঙ্গে। ব্রজেন সেন, জীতেন সেন, রাজেন সেন। এর মধ্যে রাজেন সেন ছিলেন ব্রিলিয়ান্ট বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি বড় একটা কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। থাকতেন নিজের আবিষ্কারে বিভোর হয়ে। এমন সময় হঠাৎ জানা গেল, মানে ও বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতেই বলাই মুখুজ্জে শুনল কী এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন রাজেন সেন, যার ফলে সারা পৃথিবী নাকি উপকৃত হবে।

ভাব জমাতে বলাইবাবু ওস্তাদ। তার ওপর সে জ্যোতিষি। ভাব জমাল রাজেন সেনের সঙ্গে। জ্যোতিষিতে রাজেনবাবুর কতটা বিশ্বাস ছিল কে জানে,

কিন্তু বলাইবাবুর অন্তরঙ্গ এবং মধুর ব্যবহার, বিজ্ঞানে আগ্রহ, রাজেনবাবুকে আকৃষ্ট করেছিল।

এরপরই দেখা গেল রাজেন সেন মৃত। এবং তাঁদেরই বাড়ির পুকুরে। অথচ খোকনের চিঠিতে আমরা জানতে পেরেছিলাম রাজেন সেনের জলে ডুবে মরা অস্বাভাবিক ব্যাপার কারণ উনি সাঁতার জানতেন না। আর্থারাইটিজের জন্যে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে নামবেন না। তাহলে ?'

তাতন খুব আস্তে আস্তে বলল, 'তার মানে বলাইবাবু রাজুকাকাকেও খুন করেছিল ?'

'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। কিন্তু বলতে পারিস, রাজেনবাবুকে খুন করে বলাইবাবুর কী লাভ ?

'খানিকটা বুঝতে পারছি।'

'ফর্মূলা টোকার কথা বলছিস ? কিন্তু রাতের অন্ধকারে কঙ্কালের মুখোস পরে দেওয়াল থেকে শুধু ফর্মূলা নিয়ে বলাইবাবু কী করবেন ? উনি বিজ্ঞানী ?'

'তাহলে ? রাজেন সেনকে খুন করলেন কেন ?'

ফস্ করে শুভ্র বলে উঠল, 'রাজেন সেন তো বেঁচে আছেন।'

'হোয়াট ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল তাতন।

'হ্যাঁ, নেফিউ, রাজেন সেনকে মারার প্রশ্নই ওঠে না। ওটা সাজানো ঘটনা।'

'কী রকম ?'

'পোড়ো দুর্গে অনেকদিন থেকেই একটা পাগল বাসা বেঁধে ছিল, নিশ্চয় শুনেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে রাজেন সেনকে অপহরণ করা হয়। তারপর ঐ দুর্গের একটা ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়।'

'তারমানে আমি যে গোঙানীর আওয়াজ শুনেছিলুম—'

'সেটা রাজেনবাবুরই। ওঁর ওপর টরচার করা হত। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রাজেন সেনকে বন্দীকরার পর তারই গাউন পরিয়ে পাগলটার বুকে ভারী পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পাগলের লাশ যখন উদ্ধার হয় তখন তার শরীর ফেঁপে ফুলে ঢোল। শরীরের নানা অংশ মাছেরা খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে।

তখন তাকে রাজেন সেনও বলা যায় অথবা অন্য যে কেউ।'

'তাহলে রাজুকাকা ?'

'সুস্থ এবং বহাল তবিয়তে এখন নিজের ল্যাবরেটরীতে।'

'রাজুকাকাকে আটকে রাখার কারণ তাহলে—'

'হ্যাঁ, যে আবিষ্কার তিনি করেছিলেন সেটির কাজ দুর্গের মধ্যেই সংঘটিত করে বলাইবাবু নিজের নামে তার পেটেন্ট নিতে চেয়েছিল। আবিষ্কারের যা কিছু মুনাফা সবই তার হত। আর আবিষ্কারটা বড় সাড়া জাগানো। যে কোন লোকের পক্ষে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করা কিছুই নয়।'

'আবিষ্কারটা কী?'

'সেন বাড়ির কুকুরটাকে মনে আছে?'

'হ্যাঁ কালো। রেয়ার অ্যালসেসিয়ান। ওর কথাতো তোমায় সব লিখেছিলাম।'

'কালোকে তো আগেও দেখেছিলি। তখন ওর গায়ের রঙ কী ছিল?'

'ব্লাক। তাই ওর নাম কালো।'

'ডঃ সেন, আই মীন রাজেন সেন প্রথমে একটা ওষুধ কালোর ওপর প্রয়োগ করেন। তার ফলে মাত্র একমাসের মধ্যে ওর সব লোমটোম ঝরে যায়। বাড়ির লোক মনে করে ও বুড়ো হয়েছে, মরার সময় হয়েছে, তাই ওর লোমটোম ঝরে গেছে। কিন্তু সেটা ছিল রাজেন সেনের একস্‌পেরিমেণ্ট। সব লোম ঝরে যাবার পর উনি অ্যাপ্লাই করেন ওঁর আসল আবিষ্কারের ওষুধ। তারপর দেখা গেল মাস-খানেকের মধ্যেই কালোর দেহে নতুন করে লোম গজাতে শুরু করেছে। এবং একসময় দেখা যায় ওর সারা দেহে ফিরে এসেছে পরিপূর্ণ লোমের বাহার। কিন্তু আবিষ্কারে একটু ত্রুটি ছিল। সেটা হচ্ছে উনি পূর্বের কালারটা আনতে পারেননি।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাতন জিজ্ঞাসা করে, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ—'

ওকে থামিয়ে নীল ব্যানার্জী বলে, 'ইয়েস বৎস। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ভুগছে একটা বিরাট সমস্যায়। সেটা হল 'টাক' সমস্যা। তাহলেই বুঝতে পারছিস এ ওষুধ বলাইবাবু যদি পেটেন্ট নিয়ে বাজারে ছাড়ে কী জিনিষ দাঁড়াবে?'

'সারা পৃথিবীতে হৈচৈ তো পড়বেই আর বলাইবাবু কিছু দিনের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবে।'

'রাজেন সেনের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। উনি অন্য জাতের মানুষ। পয়সার লোভ ওনার মোটেও নেই। ওষুধটা নিয়ে উনি আরো একস্‌পেরিমেণ্ট করবেন। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর ওটার ফর্মুলা তুলে দেবেন ভারত-সরকারের হাতে। সে যাই হোক, এবার আমি সূর্যনারায়ণ ওরফে বলাইবাবুর কথায় আসি। রাজেন সেনকে চোরা কুটুরীতে বন্ধ রেখে মুখুজ্জেমশাই চেষ্টা করল

ওঁকে দিয়ে ওষুধটা তৈরী করাতে। কিন্তু রাজেন সেন বেঁকে বসলেন। কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না। তারপর মুখুজ্জে দেখাল লোভ। প্রচুর অর্থ দেবে এমন আশ্বাসও দিয়েছিল বলাইবাবু। এ যেন স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকরুনকে কুবেরের ভাণ্ডারের লোভ দেখানো। রাজেন সেন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আরম্ভ হল দৈহিক টরচার। আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক কিন্তু দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে পারলেন না। রাজেন সেন নিজেই আমায় বলেছিলেন, 'আমার চামড়া বড় ডেলিকেট। একটুতেই বেশী যন্ত্রনা বোধ হয়। তারওপর লোকটা আমায় গরম লোহার ছ্যাঁকা দিত।

শুভ্র দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলল, 'ব্রুট একটা'।

'হ্যাঁ তাই। আর সেই জন্যেই রাজেন সেন বাধ্য হয়েছিলেন বলতে কোথায় তাঁর ফর্মূলা রাখা আছে।'

'দেওয়ালের গায়ে নিশ্চয় '

'হ্যাঁ। সব থেকে নিরাপদ জায়গা। হারাবে না, নষ্ট হবে না—যতদিন না চুনকাম করা হচ্ছে। ওঁর ল্যাবরেটরি ঘরের সারা দেওয়ালে অনেক অঙ্কের হিসেব আছে। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো হিজিবিজি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।'

হঠাৎ শুভ্র বলল, 'নীলকাকু, এবার আমি বুঝেছি।'

'কী ?'

'কেন সেনবাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছিল ?'

'বলাইবাবু যতই কেন সেনবাড়ির পরিচিত লোক হোক, হুট করে যখন তখন তো আর রাজেনবাবুর ঘরে গিয়ে উঠতে পারে না। তাই সে চাইছিল যেমন করেই হোক সেনবাড়ির ভেকেট অবস্থা। মেজো কর্তাকে বাগে এনেছিল, কিন্তু খোকনের বাবা এসব ভূতটুত একদম বিশ্বাসই করেন না। বলাইবাবু প্রথমে ভূত তারপর জ্যোতিষ শাস্ত্র অ্যাপ্লাই করে। ভয় দেখায় সেনবাড়িতে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিরাট অঘটন ঘটবে। আর অঘটন তো ঘটালোই। তারক হত্যা। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল।

তাতন আর শুভ্র দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। হঠাৎ তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটার এলেম আছে। এক হাতে এত সব করত কীভাবে সেটাই ভাবার ব্যাপার।

নীল ব্যানার্জী মৃদু হেসে বলল, 'একা কোথায় রে। কুকার্যে সঙ্গীর অভাব হয় না। সজলবাবু ছিল ওর ডান হাত।'

'সজলবাবু—মানে…'

'হ্যাঁ, জীতেনবাবুর শালা।'

'মেজোকাকা জানতেন ?'

'না। জীতেনবাবু লোকটা বাইরে থেকে ওই রকম কাঠ কাঠ টাইপের। কিন্তু ভেতরে একেবারে একসস্ট্রীম ভীতু। উনি সত্যি সত্যিই ভূতের ভয়ে বাড়ি ছাড়তে চেয়েছিলেন।'

সবারই সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনজনেই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'অন্য ব্যাপারগুলো না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, মাথার ওপর ডাব ছিড়ে পড়া, কিংবা ভর সন্ধ্যেবেলা রাজুকাকর মত গাউন পরে হেঁটে চলে যাওয়া—এগুলো সজলবাবুর পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু মেসোর বিছানায় কঙ্কাল শুয়ে থাকাটা—'

নীল ব্যানার্জী হেসে বলল, 'বলাইবাবুর একটা ভূতের মুখোস ছিল। এখানে লোডশেডিং হরদম হয়। কোন একদিন লোডশেডিংএর সুযোগে উনি নিজেই শুয়ে ছিলেন ব্রজেনবাবুর বিছানায়। তারপর ভয়টয় দেখানো হয়ে গেলে অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।'

'নীল কাকু আর দুটো প্রশ্ন করব,' এবার শুভ্রর গলা, 'না হলে দুর্গ রহস্যের সব ক্লীয়ার হবে না।'

'বেশ তো, বল।'

'পোড়ো দুর্গ থেকে বাঁশী বাজাতো কে ? আর রক্তাক্ত মুখটা কার ?'

'রক্তাক্ত মুখটা একটা মেকআপ। তাতন আগেই বলে দিয়েছে। আর বাঁশী ? নিরুদ্দিষ্ট হবার সময় বাঁশীটা রাজেনবাবুর কাছে থেকে গিয়েছিল। উনিই, পোড়ো দুর্গে ওঁর কোন কাজ ছিল না, মেজাজ হলেই বাঁশী বাজিয়ে সময় কাটাতেন। আর বলাইবাবু সেটাকে ভূতের বাঁশী বলে প্রচার করে দিয়েছিলেন। এনিথিং মোর ?'

'মনে পড়লে জিজ্ঞাসা করব', বলে শুভ্র জানলার ধারে গিয়ে বসল।

আবার সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর নীল ব্যানার্জী বলল, 'বলাইবাবু মরে বাঁচলেন, ভাবছি সজলবাবুর কতদিনের মেয়াদ হবে কে জানে। ওর দিদি বেচারী লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না।'

'দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষলে যা হয়।' তাতনের উক্তি।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীল ব্যানার্জী জানলার বাইরে তাকাল। শীতের সন্ধ্যা তখন খুব দ্রুতবেগে নেমে আসছে।

—